প্র ব ন্ধ

করোনা ভাইরাস নিয়ে নানান কথামালা

রা হ মা ন চৌ ধু রী

গত শতকের স্পেনিশ ফ্লু আর বর্তমানের করোনা ভাইরাস

গত শতকের ভয়াবহ মহামারি ছিল স্পেনিস ফ্লু। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মানে পঞ্চাশ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল এই ভাইরাস দ্বারা। তখন মারা গিয়েছিল দুই থেকে পাঁচ কোটি মানুষ। অনেকে ধারণা করেন মৃতের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি। সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয় এ কারণে যে, তখন হাসপাতালের নথিপত্র রক্ষার ব্যবস্থা সেরকম ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষদিকে উনিশশো আঠারো সালে এই ভাইরাসের আক্রমণ ঘটে আর প্রথম মহাযুদ্ধে যত মানুষ মারা গিয়েছিল, স্পেনিশ ফ্লুতে মারা যায় তার চেয়ে বেশি মানুষ। প্রথম মহাযুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ধরা হয় এক কোটি সত্তর লক্ষ। প্রায় দেড় বছর ধরে 'স্পেনিশ ফ্লু' নামের এই ভাইরাসের সংক্রমণ চলে। যুক্তরাষ্ট্রেই সেবার ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল। জানা যায় যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন তখন এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন যখন যুদ্ধ শেষে ভার্সাই চুক্তির আলোচনা চলছিল। সেই দিনগুলোতেও এর সামান্য চিকিৎসা ছিল না, ঠিক তখনো সকলকে মাস্ক পরে থাকতে বলা হয়েছিল। যথেষ্ট আক্রান্ত এলাকাগুলোতে সে সময়ে দোকানপাট, হাটবাজার, সিনেমা হল, গির্জা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সব বন্ধ ছিল। শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে তখন প্রধানত এটা সংক্রমিত করত। ঠিক একইভাবে মানুষ হাত দ্বারা কিছু স্পর্শ করলে আর তার সেই হাত চোখ-মুখ-নাক স্পর্শ করলে স্পেনিশ ফ্লু'র ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হতে পারত। সেই সময়ে ভাইরাসটি অধিক বিপজ্জনক ছিল ডায়াবেটিক রোগী, হৃদরোগী আর শ্বাসতন্ত্রের রোগীদের ক্ষেত্রে। বর্তমান করোনা ভাইরাসের সঙ্গে এসব ব্যাপারে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাবে স্পেনিশ ফ্লু ভাইরাসের।

যদিও এটাকে স্পেনিস ফ্লু বলা হয়ে থাকে কিন্তু তার উৎপত্তিস্থল স্পেন ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধে যুদ্ধরত দেশগুলোর মধ্যে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু জন আক্রান্ত হয়। কিন্তু যুদ্ধরত দেশের শাসকরা মনে করল, এ খবর প্রচার হয়ে পড়লে একটা আতঙ্ক দেখা দেবে এবং যুদ্ধরত দেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সেজন্য যুদ্ধরত দেশগুলো এ সংবাদ প্রচারের ওপর কড়াকড়ি নিষেধ আরোপ করে। প্রথম মহাযুদ্ধে স্পেন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল, ফলে তার সংবাদমাধ্যমের ওপর তেমন কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকায় সেখানে রোগটি দেখা দিলে পত্রিকায় সে খবর প্রকাশিত হয়। মাদ্রিদের পত্রিকায় এ খবরটি প্রথম ছাপা হলে, এই রোগ স্পেনিশ ফ্লু হিসেবে প্রচার পেয়ে যায়। কিন্তু পরে স্পেন মনে করতে শুরু করে ভাইরাসটির প্রথম উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ফ্রান্স, ফলে সেটাকে 'ফ্রেন্স ফ্লু' নামকরণ করে স্পেন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়ে কেউ বলতে পারেননি ভাইরাসটির উৎপত্তিস্থল কোনটি– ফ্রান্স, চীন, ব্রিটেন নাকি যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু স্পেন যে নয় এ ব্যাপারে সকলে নিশ্চিত, কারণ তার আগেই যুক্তরাষ্ট্রে এ রোগ শনাক্ত করা হয়। প্রথম রোগী শনাক্ত হয় যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসে সামরিক বাহিনীর মধ্যে উনিশশো আঠারো সালের এগারই মার্চ। বহু জন মনে করতে শুরু করে সৈনিকেরা এই রোগ ছড়িয়েছিল। কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে তারা এক দেশ থেকে আর এক দেশে যেত। যুদ্ধের কারণে তখন সৈন্যদের একসঙ্গে চলতে হত, ফলে এভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট সেনাবাহিনী এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলে পরে বিধ্বস্ত ইউরোপে যে রকম অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল সে প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র বহু দেশকে ঋণ প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্র তখন পৃথিবীর সর্বশক্তিমান দেশ। ইউরোপের দেশগুলো যুদ্ধশেষের নানা বিপর্যয়ে এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী ছিল। ফলে যা 'স্পেনিশ ফ্লু' নামে পরিচিত সে রোগটি যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরম্ভ হয়েছিল ইউরোপের পক্ষে কণ্ঠ উঁচু করে সে-কথা বলার সুযোগ ছিল না। ফলে শেষ পর্যন্ত রোগটির নাম 'স্পেনিশ ফ্লু' হয়েই রইল। স্পেন দায়ী না হলেও দোষ তার ঘাড়েই পড়ল ঘটনাচক্রে।

যখন এই ভাইরাস বিশ্বের চল্লিশ শতাংশ মানুষকে আক্রান্ত করে তখনো এর কোনো চিকিৎসা ছিল না। মহাযুদ্ধের কারণে তখন বিভিন্ন দেশে প্রচুর চিকিৎসক মারা গিয়েছিল। যুদ্ধের কারণে বহু হাসপাতাল ধ্বংস হয়েছিল। ফলে স্পেনিশ ফ্লু নিয়ে খুবই ভয়াবহ বিভৎস সময় পার করছিল মানুষ। যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের মূল হাসপাতালগুলোর অধিক সংখ্যক বিধ্বস্ত হওয়ায় বিভিন্ন ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন করে হাসপাতাল বানানো হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিয়ে রোগীদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয়। ভিন্ন দিকে 'কোয়ারেন্টাইন' ব্যবস্থা চালু করতে হয়েছিল। চার্চিল নিজেও এ সময়ে 'কোয়ারেন্টাইন'-এ ছিলেন। রাস্তায় কেউ থুথু ফেললে রোগ ছড়াতে পারে সে বিবেচনায় রাস্তায় কেউ থুতু ফেললে জরিমানা করা হত। যদিও ওষুধ ছিল না, কিন্তু বায়ার কোম্পানির 'অ্যাসপিরিন'কে তখন ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় অনেক ক্ষেত্রে। যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম এটা ব্যবহার শুরু হয়েছিল, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীর সার্জন জেনারেল এবং 'জর্নাল অফ দ্য

আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' এই ওষুধটা ব্যবহারের পক্ষে কথা বলে। তাদের পরামর্শ ছিল প্রতিদিন রোগীকে ত্রিশ গ্রাম অ্যাসপিরিন দিতে হবে। পরবর্তীকালে এটাকে অতিরিক্ত ডোজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরে অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করে তখন প্রচুর রোগীর মৃত্যু হয়েছিল অ্যাসপিরিনের বিষক্রিয়ায়। মনে করা হয়, সে চিকিৎসাটি সঠিক ছিল না। নিশ্চয় 'বায়ার' নামক ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল কিছু কিছু চিকিৎসক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই 'বায়ার' নাজি হিটলারকে প্রচুর অর্থসহায়তা দিয়েছিল।

যুদ্ধ শেষে সৈন্যরা ফিরে এলে দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহভাবে স্পেনিশ ফ্লু ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া তখন গা করেনি এই রোগটিকে নিয়ে। সেখানকার জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের মতোই বলেছিল, এটা একটা সাধারণ জ্বর বা ফ্লু। ফলে সেপ্টেম্বরের আটাশ তারিখে যুদ্ধ শেষে শহরের বিজয় প্যারেড দেখতে দশ হাজার লোক যোগদান করে আর তা ভয়াবহ রকমভাবে রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। সেই ঘটনার দশ দিনের মধ্যে এক হাজারের বেশি মানুষ মারা যায় এবং দু'লাখ মানুষ সংক্রমিত হয়। ফিলাডিলফিয়ার কর্তৃপক্ষ তখনি সবকিছু বন্ধ ঘোষণা করে। পরবর্তী বছরের মার্চের মধ্যে ফিলাডেলফিয়ায় পনেরো হাজার মানুষ এই রোগে মারা গিয়েছিল। বহুরকম বিপর্যয় ঘটিয়ে, বহু মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়ে বিশ্বব্যাপী উনিশশো উনিশ সালের গ্রীষ্মকালে স্পেনিশ ফ্লু'র সংক্রমণ বন্ধ হয়। প্রাকৃতিকভাবেই তা ঘটেছিল, চিকিৎসার দ্বারা নয়। হয় মানুষ ততদিনে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল না-হলে শরীরে ততদিনে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু স্পেনিশ ফ্লু'র প্রতিষেধক ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছিল উনিশশো চল্লিশ সালে। স্পেনিশ ফ্লু'র ভয়াবহ আক্রমণে মানুষ কোনো ওষুধ এবং কোনো 'ভ্যাকসিন' ছাড়াই পৃথিবীতে টিকে রইল অনেক মর্মান্তিক ঘটনার ভিতর দিয়ে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ আর ঠিক তার সমসাময়িক এই মহামারিকে ঘিরে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বিরাট অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়নি। নিঃসন্দেহে যুদ্ধ শেষে খাদ্যসঙ্কট ছিল বিভিন্ন দেশে। যুদ্ধশেষে জার্মানিতে দেখা গিয়েছিল মুদ্রা-বিপর্যয় আর ভয়াবহ বেকারত্ব। সত্তর লক্ষ মানুষ কর্মহীন ছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধের দশ বছর পর মহামন্দা নেমে এসেছিল যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশে। ঠিক তার দশ বছর পর আরম্ভ হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি আর তা চলমান সময়ে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ আর স্পেনিশ ফ্লু ধ্বংস করতে পারেনি সেভাবে পাশ্চাত্যের অর্থনীতিকে, ঠিক বিশ বছরের মাথায় তা হলে মানুষ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে নিশ্চয় আর একটি যুদ্ধ আরম্ভ করতে পারত না। যুদ্ধে যেমন ব্যয় হয়, ঠিক সেভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ আয়ও হয় ধনীদের।

বর্তমান শতকের সার্স আর মার্স

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্ব জ্ঞানবিজ্ঞান ধনসম্পদে বহু অগ্রগতি লাভ করলেও, ভাইরাস রোগের চিকিৎসায় সেভাবে অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। কথিত বিভিন্ন ভাইরাসের রোগ প্রতিরোধে চিকিৎসাবিজ্ঞান 'স্পেনিশ ফ্লু'র সময় যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, বর্তমানে বলতে গেলে প্রায় সেখানে আছেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে বিশ-একুশ শতক নানারকম বিস্ময়কর অবদান রাখলেও, ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে নতুন কোনো অবদান লক্ষ করা যায়নি। বরং বলা যায়, ভাইরাস-রোগ প্রতিরোধে উনিশ শতকের শেষপাদে যতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছিল তার ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান বিশ্ব চলছে। সার্স, মার্স সব ক্ষেত্রেই এটা প্রমাণিত হয়েছে। সার্স-যুদ্ধে লড়াই করেছেন এমন একজন ব্যক্তি ব্রেইন ডোবারস্ট্রাইন বলেন, সত্যি বলতে একুশ শতক সার্স ভাইরাস প্রতিরোধে কম ভূমিকা রেখেছে, সার্স নিয়ন্ত্রণে উনিশ শতকের চিন্তা-ভাবনা বা প্রযুক্তি যথেষ্ট মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। কিছুতেই এ কথা অস্বীকার করা যাবে না, উনিশ শতকের আবিষ্কার দিয়েই আমরা একুশ শতকে লড়ছি। বহুজনই কথাটা বলেছেন, বিভিন্ন বড় বড় ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী নয়। কবে ভাইরাসের আক্রমণ হবে তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলো টাকা খরচ করতে চায় না, কারণ মুনাফা তাদের কাছে প্রধান কথা। স্বল্পকালীন সময় বা এককালীন সময়ে জন্য ওষুধ বিক্রিতে তেমন মুনাফা নেই। ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলোও পরিচালিত হয় ধনীদের স্বার্থ দ্বারা। ফলে ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধে সেসব দেশের সরকারগুলোও খুব উৎসাহ দেখায়নি। স্মরণ রাখতে হবে, পৃথিবীর বেশির ভাগ ধনী দেশ চিকিৎসাসেবা দেয় না, চিকিৎসা বিক্রি করে।

ফলে ভাইরাস নিয়ে গবেষণা বন্ধই ছিল বলা যায়। ভাইরাসের আক্রমণ হলে তখন কিছুটা তাৎক্ষণিক উত্তেজনা লক্ষ করা যায় মাত্র সরকারগুলোর মনোভাবে। কিন্তু সুদূর লক্ষ্য নিয়ে ভাইরাস প্রতিরোধে উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি বিশ্বের কর্তাব্যক্তিদের। ফলে সার্স রোগের আক্রমণেও বিশ্ব দিশেহারা হয়েছিল। সার্স রোগ মানে 'সিভিয়ার একিউট রেসপাইরেটরি সিনড্রোম' বা সার্স রোগের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় দুই হাজার দুই সালের নভেম্বর মাসের ষোল তারিখে। চীনের গুয়ানজং প্রদেশের ফসহান শহরে সেদিন পঁয়তাল্লিশ বছরের এক যুবকের শরীরে এই রোগ সনাক্ত হয়। খুব উচ্চমাত্রার জ্বর, শুকনা কাশি আর সেইসঙ্গে তার শ্বাসতন্ত্রকে অকার্যকর করে তোলে। দুঃখজনকভাবে তার শ্বসনযন্ত্র দ্রুত বিকল হয়ে পড়ে। চীন কিন্তু তখন রোগটি সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে অবগত করে না। যখন রোগটি প্রথম আরম্ভ হয় দেখা গেল খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কৃষক, দোকানদার বা রান্নার সঙ্গে যুক্তরা সংক্রামিত হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে তা স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ আক্রান্তরা যখন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যান তা ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকদের আক্রান্ত করে। যখন রোগটি চীনে ভালোভাবে

ছড়িয়ে পড়ে তখন গুয়াজং প্রাদেশিক সরকার এগারো জানুয়ারি স্থানীয়ভাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে এই রোগটির কথা ঘোষণা করে। দুই হাজার তিন সালের একত্রিশে জানুয়ারি দেখা যায় সার্স ভাইরাস দ্বারা গুয়ানজংয়ের সান ইয়াৎ সেন চিকিৎলয়ের ত্রিশ জন স্বাস্থ্যসেবিকা সংক্রমিত হয়ে পড়েছেন। পরে গুয়াজংয়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা রোগটি নানাভাবে ছড়াতে থাকে। বিভিন্ন কারণে পরে মনে করা হয় প্রাণী থেকে এই রোগ মানুষের দেহে ছড়িয়েছিল, যা ছিল মানুষের ফুসফুসের প্রদাহঘটিত গুরুতর রোগ।

চীন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে রোগটি সম্পর্কে জানায় দুই হাজার তিন সালের দশ ফেব্রুয়ারি। চীনে তখন ১০৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী সহ মোট ৩০৫ জন আক্রান্ত আর তার মধ্যে মারা গিয়েছে পাঁচ জন। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তা আরো বেড়ে যায়। দুই হাজার তিন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই রোগটি চীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তার পরেই চীনের বাইরে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। চীনে প্রথম রোগটি সনাক্ত হবার স্বল্পদিন পরেই গুয়ানজংয়ের সান ইয়াৎ সিন হাসপাতালের বয়স্ক একজন চিকিৎসক লিউ হংকং ভ্রমণে যান তাঁর এক আত্মীয়ের বিয়েতে। তিনি কাউলনের মেট্রোপল হোটেলের নবম তলায় অবস্থান করেন যেখানে সেইসময়ে বিভিন্ন দেশের আরো অনেক ভ্রমণকারী ছিলেন। বৃদ্ধ এই চিকিৎসক নিজে তখন সার্স রোগে আক্রান্ত ছিলেন যা তিনি জানতে পারেননি। কাউলন হোটেলে অবস্থানকালে লিউ নবম তলার ৭ জন সহ মোট ২৩ জনের মধ্যে রোগটিকে নিজের অজান্তেই সংক্রমিত করেন। বাইশে ফেব্রুয়ারি যখন তাঁর নিজের রোগ ধরা পরে, লিউকে হংকংয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। লিউ হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের সাবধান করে দিয়ে বলেন যে তাঁকে যেন সকলের কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হয়। তিনি মার্চের ৪ তারিখে সেখানে মারা যান। লিউ'র মাধ্যমে তাঁর ভগ্নিপতি আক্রান্ত হন পহেলা মার্চ, তিনিও হংকংয়ের একটি হাসপাতালে মারা যান মার্চের ১৯ তারিখে।

চিকিৎসক লিউ'র এই ভ্রমণের ঘটনা থেকে রোগ চীনের মূল ভূখে-র বাইরে হংকং থেকে আরো অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভ্রমণকারীরা তখনো কেউই জানতেন না যে তাঁরা রোগটি বহন করছেন। কাউলন হোটেলে অবস্থানকালীন অতিথিদের মধ্যে তিনজন ফিরে যান সিঙ্গাপুরে, একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, একজন আয়ারল্যান্ডে আর একজন ভিয়েতনামে, দুজন কানাডায় এবং সকলেই তাঁরা রোগটিকে বহন করে নিয়ে যান। কাউলন হোটেলের বিদেশি অতিথিদের বাকি কয়েকজনকে সার্স ভাইরাসে আক্রান্তের কারণে হংকংয়ের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মেট্রো হোটেলের সাতাশ বছরের এক অতিথি রোগীকে চিকিৎসা দিতে গিয়ে হংকংয়ের প্রিন্স অব ওয়েলস হাসপাতালের নিরানব্বই জন স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হন। ভিয়েতনামে রোগটিকে বহন করে নিয়ে যান একজন চীনা-আমেরিকান নাগরিক জনি চেন। তিনি ছিলেন মূলত সাংহাইয়ের অধিবাসী। তিনি রোগটি ধরা পড়লে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি হ্যানয়ের 'ফ্রেন্স হসপিটাল অব হ্যানয়'-এ ভর্তি হন এবং সে হাসপাতালের ৩৮ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে সংক্রমিত করেন। তিনি ১৩ মার্চ মারা যান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মকর্তা কার্লো ছিলেন সংক্রমণ রোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি চেনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত হন এবং ২৯ মার্চ মারা যান।

কানাডার একজন বয়স্ক মহিলা যিনি হংকংয়ে মেট্রো হোটেলের অতিথি ছিলেন, তিনি কানাডাতে ফিরে এসে সার্স রোগের আক্রমণে ৫ মার্চ মারা যান। তাঁর ছেলে সংক্রমিত হয়ে মারা যান ১৩ মার্চ। বিভিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে রোগটির খবর পৌঁছে যায়। ইতিমধ্যে অনেকেই জেনে গেছে রোগটি প্রথম চীন দেশে সনাক্ত হয়েছে আর তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে সঙ্গে সঙ্গে অবগত না-করার জন্য চীন সমালোচিত হয়। যদিও দুই হাজার তিন সালের জানুয়ারি মাসে গুয়ানজং প্রাদেশিক সাংবাদিক সম্মেলনে রোগটির কথা ঘোষণা করেছিল, কিন্তু দুই হাজার তিন সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি চীন সরকার তাদের তথ্য প্রকাশ করে এবং ততদিনে চীনে তিনশো পাঁচ জন আক্রান্ত হয়েছে। চীন আরো আগে তথ্যটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে না-জানাবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিয়ে বলে, বিশ্বকে এ ব্যাপারে আগে সতর্ক না-করাতে রোগটির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। মার্চের বারো তারিখের মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ রোগটি সম্পর্কে সারা পৃথিবীকে সতর্ক করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বের নাগরিকদের পরামর্শ দেয় আক্রান্ত দেশ বা অঞ্চলগুলো ভ্রমণ না-করতে। দুই হাজার তিন সালের ফিফা-র মহিলা বিশ্বকাপ সে কারণে চীন থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয় যুক্তরাষ্ট্রে। আইস হকির মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল তা বাতিল করা হয়। বিভিন্ন আক্রান্ত দেশগুলো সভা-সেমিনার আন্তর্জাতিক সম্মেলন– এসব স্থগিত করে। চীন-সহ আক্রান্ত অঞ্চলের খাবারের দোকানের ব্যবসা সবচেয়ে বেশি লোকসান দিয়েছিল। হংকংয়ের পর্যটন ব্যবসায় বিপর্যয় ঘটেছিল।

সার্সের লক্ষণ ছিল অন্যান্য ফ্লু'র মতোই। উচ্চমাত্রার জ্বর, শুকনো কাশি, মাথাব্যথা, ডায়ারিয়া, চামড়ায় র‍্যাশ হওয়া, ক্ষুধামন্দা, শ্বাসকষ্ট। কিন্তু রোগটা কীভাবে ছড়াত প্রথমে বিজ্ঞানীরা খুব একটা নিশ্চিত হতে পারেননি– কিন্তু এটা নিশ্চিত ছিল রোগীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এটা ছড়ায়। সার্সের মৃত্যুর হার ছিল শতকরা প্রায় দশজন। কিন্তু সার্স ভাইরাসের লক্ষণ দু-তিন দিনের মধ্যেই ধরা পড়ত। ফলে সার্স ভাইরাস খুব লম্বা সময় ধরে নীরবে সাধারণ মানুষের মধ্যে রোগ ছড়াতে পারত-না বলে, খুব বেশি মানুষ এর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেনি। কিন্তু তার পরেও একত্রিশটি দেশে এ রোগের সংক্রমণ ঘটেছিল। সবচেয়ে বড় সংক্রমণ ঘটে

চীন আর হংকংয়ে। চীনে মোট আক্রান্ত হয়ে ৫০২৭ আর মারা যায় ৩৪ জন। হংকংয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৭০৫ আর মারা যায় ২৯ জন। তাইওয়ানে আক্রান্ত হয় ২৪৬ জন মারা যায় ৭ জন। সিঙ্গাপুরে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৩৮ মারা যায় ৩ জন। যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৭ কিন্তু কেউ মারা যায়নি। সকল দেশ মিলিয়ে মোট আক্রান্ত হয়েছিল ৮০৯৬ জন মারা যায় ৭৭৪ জন। বিভিন্ন দেশ আক্রান্ত হলে যখন মাস্ক পরার কথা বলা হয়, কোয়ারেন্টাইনে যাবার সিদ্ধান্ত আসে ঠিক তখনি হঠাৎ রহস্যময়ভাবে ভাইরাসটির আক্রমণ কমতে থাকে। মাত্র আট মাস এই ভাইরাস তার প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। দুই হাজার তিন সালের পাঁচ জুলাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করে যে সার্স ভাইরাসের সংক্রমণের ভয় দূর হয়ে গেছে। কিন্তু তার পরেও কিছু কিছু সংক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। দুই হাজার চার সালের মে মাসের পর আর সার্স আক্রান্তের খবর পাওয়া যায় না। সার্স ভাইরাসের রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যাওয়ার কারণ এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেনি। সার্স আক্রমণের সময় যে সংক্রমণ রোধে যে টিকা আবিষ্কারের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল তা তখন স্থগিত হয়ে যায়।

সার্স যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা মিলিতভাবে এটা প্রতিরোধ করার জন্য সমন্বিতভাবে কাজে নেমেছিলেন। ব্রেইন ডোবারস্টাইন তাঁদের একজন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে গেছেন। তিনি মনে করেন, এ ধরনের ভাইরাসের আক্রমণকালে 'স্বচ্ছতা হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নীতি রোগটিকে প্রতিরোধ করার জন্য'। তিনি লিখেছেন, প্রথমদিকে বহু দেশই সঠিক তথ্য দিতে চাইত না। তিনি এ কারণে বলেছেন যে, এই ধরনের সর্বগ্রাসী মহামারির ক্ষেত্রে 'বিশেষ কোনো একটি দেশের খোলাখুলি নিজেকে প্রকাশ না-করা বা দায়িত্বহীনতার পরিচয় শুধু তার নিজের দেশকেই নয়, সারা বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে।' যদিও সার্স ভাইরাসটি রহস্যজনকভাবে দুর্বল হয়ে যায়, কিন্তু ডোবারস্টাইন পরে খুশি মনেই লিখেছেন, সার্স ভাইরাস রুখতে নজিরবিহীনভাবে সারাবিশ্বের বিজ্ঞানীরা এক হয়েছিল। সকলে খোলামনে এবং সদিচ্ছা নিয়ে অন্যদের কাজে সাহায্য করেছে, যত দ্রুত সম্ভব তাদের বৈজ্ঞানিক তথ্য জানাতে কার্পণ্য করেনি। ফলে দ্রুত ভাইরাসটির চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে, বলতে গেলে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার এক সপ্তাহের মধ্যে। বিজ্ঞানের জগতে ভাইরাস রুখবার প্রচেষ্টায় সেবার প্রত্যেকে তাদের সেরাটাই দিয়েছিল। পারস্পরিক সহযোগিতা এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। তিনি আরো বলেছিলেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্য হবে যদি আমার দুই হাজার তিন সালের অভিজ্ঞতা থেকে না-শিখি এবং তাকে কাজে না-লাগাই। সার্স বুঝিয়ে দিয়েছে যদি আমরা সকলে যথেষ্ট ভালো প্রস্তুতি নিয়ে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করি তাহলে যুদ্ধটা সহজ হবে আর তখনই আমরা সংক্রমণকারী রোগগুলোর বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়তে পারব। বিশ্বে এমন কোনো দেশই নেই যে সম্পূর্ণ একা এই ভয়াবহ রকম সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে পারে।

সার্সের পর আবার মার্স-এর দেখা পাওয়া গেল দুই হাজার বারো সালে প্রথম মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। মিডল ইস্ট রেসপাইটোরি সিনড্রোম বা মার্স আরম্ভ হয় প্রথম সৌদি আরবে। সেখানকার একজন পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ দুই হাজার বারো সালের তেরো জুন থেকে জ্বরে ভোগার পর এগারো দিনের মাথায় মারা যান। তাঁর জ্বর, কাশি আর শ্বাসকষ্ট ছিল। সে বছরের সেপ্টেম্বর মাসের বারো তারিখে কাতারের একজনের এমনটাই ঘটে যা সৌদি রোগীটির ঘটেছিল। সেই সময়ে ইউরোপীয় সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল তখন যে দেশগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তার একটা তালিকা তৈরি করে। সে দেশগুলো হল– বাহরাইন, ইরাক, ইজরায়েল, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, প্যালেস্টাইন, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সিরিয়া, ইউনাইটেড আরব আমিরাত এবং ইয়েমেন। দুই হাজার তেরো সালের জুনের মধ্যে ৫৫ জন আক্রান্তকে পাওয়া যায় যার মধ্যে ৩১ জন মারা যায়। তার মধ্যে ৪৫ জনই ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের, যেমন: সৌদি আরব, জর্ডান, কাতার, আরব আমিরাতের মানুষ। ৮ জন ছিলেন ইউরোপের– ফ্রান্স, ইতালি ও ব্রিটেনের, ২ জন ছিলেন আফ্রিকার তিউনিশিয়ার। দুই হাজার চোদ্দ সালে আক্রান্ত পাওয়া গেল ২৫৫ জন। সে বছরের মে মাসের মধ্যে সংক্রমিত হল ৫৭০ জন মারা গেল ১৭৩ জন। মার্স বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেও তার সংক্রমণের হার বেশি ছিল না। মনে হয় সৌদি আরবে হজ করতে এসে অনেকে নিজ শরীরে রোগটি বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। মার্স ভাইরাস যে শুধু মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হত ব্যাপারটা তা নয়। নিশ্চয় আক্রান্ত রোগীর খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে একজন মানুষের শরীর থেকে আর এক জন মানুষের শরীরে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মানুষ ছাড়াই অন্যভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বহু জন মনে করেন, উট থেকে মানুষ আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। ফলে এ রোগ ছড়ানোর কারণটি এখনো সুনির্দিষ্ট নয়। মার্স ভাইরাস কীভাবে ছড়াত বর্তমান রচনায় এটা আলোচনার প্রধান বিষয় নয়। বিজ্ঞানীদের কাজ সেটা কীভাবে মার্স ছড়াত সেটা আবিষ্কার করা। মার্স নিয়ে বক্ষ্যমান রচনায় সামান্য প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ হল ভিন্ন একটি দিকনির্দেশনা খুঁজে পাওয়া।

যখন সার্স-২ বা কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো খুবই ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। লক্ষ করলে দেখা যাবে সৌদ আরবের মানুষদেরকে অনেকেই মনে করে বর্বর। যদিও সেমিটিক অনেক পুরনো সভ্যতা কিন্তু তা সত্ত্বেও সৌদি জনগণ বা সৌদি আরব দেশটি নিয়ে মানুষের মনে খুব ভালো ধারণা নেই। কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে বলা যাবে সৌদি আরব একটি যুগান্তকারী বা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে। ইসলাম ধর্মের সূতিকাগার আর ইসলামের পয়গম্বরের জন্ম যেখানে, সেই সৌদি আরব প্রথমেই কাবা শরীফ বন্ধ ঘোষণা করে। মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু সকল সময় বলা হয় ইসলাম একটি কট্টর ধর্ম। বলা হয়, মুসলমানেরা অন্ধ আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ; যাদের

জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি সামান্য আগ্রহ নেই। করোনা ভাইরাসের আক্রমণে সারা বিশ্বে সবচেয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপটি গ্রহণ করে কিন্তু সেই সৌদি আরব। ধর্মীয় সমস্ত কুসংস্কারকে বাতিল করে বিজ্ঞানসম্মত পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে। কারো সাহস হয়নি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। ধর্ম পালন রাষ্ট্র নিষেধ করেনি, ধর্ম পালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সকলের ছিল। কিন্তু ধর্ম সৌদি আরবের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেনি। স্বাস্থ্য বা মানুষের জীবন আগে, তার পরে ধর্মীয় বাড়াবাড়ি। সৌদি আরবে আগামী বছরে হজ পালিত হবে না করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের কারণে। কিন্তু হজ সৌদি আরবের একটি বড় উপার্জনের জায়গা। সৌদি আরব সেটা নিয়ে সামান্য মাথা ঘামাচ্ছে না। স্বীকার করতেই হবে, করোনা ভাইরাসে আক্রমণ প্রতিরোধে সৌদি আরব বহু বিজ্ঞানসম্মত দেশের চেয়ে নিজের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়েছে।

বিষয়টা লোক-দেখানো ব্যাপার ছিল না। সৌদি আরব করোনা আক্রমণের ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছিল। ধর্ম পালনের নাম করে জনগণকে জমায়েত করতে দিলে যে প্রাণহানি ঘটবে, রাষ্ট্র সেটা বুঝতে পেরেছিল। রাজতন্ত্র সম্পর্কে যতই নেতিবাচক হোক মানুষের ধারণা, সৌদি রাজপরিবার জনগণের জানমাল নিয়ে যে দুশ্চিন্তা করে তার প্রমাণ রেখেছে। গণতান্ত্রিক বহু দেশ তার জনগণের নিরাপত্তা বিধানে সেটুকু করার চেষ্টা দেখায়নি। ফলে সৌদি আরবকে চট করে বর্বর বলার আগে বহু বার বিবেচনা করতে হবে, রাজতন্ত্র তার প্রজার জন্য যা পেরেছে, ভারত এবং বাংলাদেশ সহ বহু রাষ্ট্রের সরকার কি জনগণের মঙ্গলের জন্য সেরকম কোনো উদাহরণ সৃষ্টি করতে পেরেছে। জনগণের মঙ্গলের জন্য সৌদি আরব ধর্মীয় স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে সামান্য পাত্তা দেয়নি। জুম্মার নামাজ, ঈদের জামাত সব বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু সকল রকম জমায়েত নিষিদ্ধ করার পরেও দেখা যাবে, সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক। সাড়ে তিন কোটি মানুষের দেশে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সোয়া লাখ। যদি কাবা শরীফে নামাজ পড়া, উমরা করার অধিকার দান, জুম্মার নামাজ আদায় করা ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়গুলো চালু রাখা হত তা হলে আক্রান্তের সংখ্যা কত গুণ বাড়ত? ফলে সরকার যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, যখন রচনাটি তৈরি হচ্ছে তখন সৌদি আরবে আক্রান্ত জনসংখ্যা হল ১১২২৮৮ আর মৃতের সংখ্যা মাত্র ৮১৯। সৌদি আরবকে কি তাহলে বর্বর দেশ বলা যাবে? জনবিচ্ছিন্ন দেশ বলা যাবে? যখন সৌদি আরবে মৃতের সংখ্যা ৮১৯ তখন কানাডাতে আক্রান্ত ৯৭১২৫ জনের মধ্যে মৃতের সংখ্যা ৭৯৬০।

মধ্যপ্রাচ্যের আরো কয়েকটি দেশ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। কাতারে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৩৫৯৫ আর মৃতের সংখ্যা মাত্র ৬৬। ইউনাইটেড আরব আমিরাতে আক্রান্তের সংখ্যা ৪০৫০৭ আর মৃতের সংখ্যা ২৮৪। কুয়েত আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩৮২৩, মৃতের সংখ্যা ২৭৫। ওমানে আক্রান্তের সংখ্যা ১৮৮৮৭, মৃতের সংখ্যা ৮৪। সবগুলো দেশের সংখ্যা যদি যোগ করে মিলিয়ে দেখা হয়, তা হলেও মৃতের শতকরা হার এক শতাংশ হচ্ছে না। দাঁড়াচ্ছে মাত্র ০.৬-এর কাছাকাছি। কিন্তু সারা বিশ্বের গড় মৃতের হার সেখানে ৫শতাংশের বেশি। সবচেয়ে বেশি মৃতের হার ফ্রান্সে প্রায় আঠারো শতাংশের বেশি, ব্রিটেনে ১৪ শতাংশের বেশি, স্পেনে ১০ শতাংশের মতো। ব্যাপারটা কি তাহলে এমন হতে পারে যে, সৌদি বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো মার্স ভাইরাসের আক্রমণের পর এ ব্যাপারে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল বা মার্স ভাইরাসের আক্রমণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছে? না হলে এরকম সাফল্য খুব সচরাচর ঘটে না। যদি লক্ষ করি দেখা যাবে ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর সবচেয়ে বেশি সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘনবসতিপূর্ণ শহর সিঙ্গাপুরে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯৩৮৭ জন হলেও মৃতের সংখ্যা মাত্র ২৫ জন। ভিয়েতনামে মৃতের সংখ্যা নেই আর আক্রান্তের সংখ্যা দীর্ঘদিনেও সাড়ে তিনশোর বেশি হতে দেয়নি। বিষয়টা কি এমন কিছু যে, সার্স-১-এর অভিজ্ঞতা তাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে সাহায্য করেছিল। করোনা নিয়ন্ত্রণে সব মিলিয়ে এশিয়ার সাফল্য পাশ্চাত্যের চেয়ে বহু গুণ বেশি। মৃতের সংখ্যা পাশ্চাত্যের চেয়ে প্রাচ্যে অনেক কম। নিশ্চয় এর কারণ নিয়ে পরবর্তীতে বিজ্ঞানীদের গবেষণা করার সুযোগ থাকবে। মার্স সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তখনি একটি ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে, মার্স ভাইরাসটি পরে আরো বড় মহামারি আকারে বিশ্বে আবার দেখা দিতে পারে। সে কারণে এ নিয়ে গবেষণার প্রস্তাবও রেখেছিল। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সে প্রস্তাব ধনী দেশগুলোর কাছে গুরুত্ব পায়নি। বিশ্বের ধনী দেশগুলো নিজেরাও গবেষণায় তেমন আক্রমণ দেখায়নি। কিন্তু তখন থেকে গবেষণা চালিয়ে গেলে বর্তমানে করোনা ভাইরাসের আক্রমণে বিশ্বের সকল দেশকে এভাবে দিশেহারা হতে হত না।

বিশ্বে নভেল করোনা ভাইরাসের আগমন

বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তাঁর 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে দেখান, সিজার নিজের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সিনেট ভবনের দিকে যাচ্ছেন তিনি সিনেটরদের সঙ্গে, যারা সামান্য পরে তাঁকে হত্যা করবে। সিনেট ভবনে যাবার পথে সাধারণ নাগরিক আর্তেমিডোরাস রাস্তায় দাঁড়িয়ে জুলিয়াস সিজারকে সাবধান করতে চায়। সিজারকে যে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে সে কথা জানিয়ে সে সিজারের হাতে একটি পত্র দিতে চায় কিন্তু সিজার তাকে পাত্তা দেন না। ঘটনার কিছু পরে সিনেট ভবনে সিজারের হত্যাকা-টি ঘটে। হয়তো নাটকের আর্তেমিডোরাস কিছুটা কাল্পনিক, কিন্তু সিজার যে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নিজে সচেতন না-হয়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রাণ দেন, ইতিহাসের সত্যি ঘটনা এটা। পৃথিবীর ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে

সতর্কবাণীর প্রতি অনেকেই গা করেন না। খামখেয়ালিপূর্ণ আচরণ করে থাকেন। সেগুলো প্রায় সময় ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। পৃথিবীর অন্যতম ধনী বিল গেটস ভাইরাস দ্বারা ভয়াবহভাবে সংক্রমণ সম্পর্কে ২০১৫ সালে বিশ্বকে সতর্ক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আনবিক শক্তি বা অস্ত্র নয়, ভবিষ্যতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিপদ আসবে ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার মাধ্যমে, যার পরিণতিতে দশ মিলিয়ন মানুষ মারা পড়তে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'মহামারি বন্ধ করার ব্যাপারে খুব কম বিনিয়োগ করছি আমরা'। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন জ্যোতিষিদের মতো নয়, বিজ্ঞানমনস্কভাবে বিশ্বের অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে।

বিভিন্ন ভাইরাসের সঙ্গে ইবোলা-র আক্রমণ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, ইবোলা দ্বারা ভয়াবহ মহামারি ছড়িয়ে পড়ার হাত থেকে পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে কাকতালীয়ভাবে কয়েকটি সুবিধাজনক কারণে। নতুন ভাইরাসের আক্রমণে ভবিষ্যতে তেমনটা না-ও ঘটতে পারে। কিন্তু বিশ্ব-নেতৃবৃন্দ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি এমনকি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সঙ্গতি কম আর গবেষণার ক্ষেত্রে তারা রক্ষণশীল বা আমলাতান্ত্রিক। ধনী রাষ্ট্রগুলোকে খুশি রাখতে চায় নিজেদের চাকরির সুযোগসুবিধা ঠিক রাখার জন্য। বিল গেটস ভাইরাসের আক্রমণ সম্পর্কে পরেও কয়েকবার তাঁর আশঙ্কার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, তাতেও লাভ হয়নি। রাষ্ট্রনায়কেরা, রাষ্ট্রের মহাশক্তিধর পরিচালকেরা সহ চিকিৎসাজগতের মহারথীরা থোড়াই কেয়ার করেছে। বহু জন অবশ্য এ-রকম প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছেন যে, বিল গেটস তা এত নিশ্চিতভাবে জানলেন কী করে? তিনি কি চাইছেন বিশ্বের বড় বড় ব্যবসায়ীদের পারমানবিক অস্ত্রের পেছনে টাকা না-ঢেলে মহামারি সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে? কিন্তু হাতে তথ্য-উপাত্ত ছাড়া সেসব বিতর্কে যেতে চাই না। বিল গেটসের আরো আগে দু হাজার সাত-আট সালের দিকে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশ একই কথা বলেছেন ভাইরাসের আক্রমণ সম্পর্কে। তিনিও বলেছেন, সামনের দিনের বিরাট বিপদ আসবে ভাইরাসের আক্রমণ দ্বারা। কিন্তু তিনি সতর্ক করে দিলে নিজে এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেননি।

যখন চীনে গত ডিসেম্বরে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ আরম্ভ হল, চীন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে তা সঙ্গে সঙ্গে অবগত করে। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেটাকে নতুন একটা খবর ছাড়া খুব বেশি ভয়াবহ মনে করেনি। বিশ্বকে এ ব্যাপারে বা নতুন করোনা ভাইরাসের মহামারি সম্পর্কে প্রথম দু'মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেইভাবে সতর্ক করেনি। বড়-ছোট বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধারসহ সংশ্লিষ্টরা ব্যাপারটাকে পাত্তা দেননি। ফল যা হবার হয়েছে। বিরাট বিরাট দেশ বলে যাদের লোকে সমীহ করত, তারাই এখন ভয়াবহভাবে করোনা ভাইরাসের শিকার। চীন হয়তো উহানেই করোনা ভাইরাসকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারত বাকি বিশ্বের সহযোগিতা পেলে। চীন সেরকম কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েই পুরো শহরটাকে কারাগার বানিয়ে এর প্রতিবিধান করার পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু বাইরে বসে আমাদের অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল সেটা নিষ্ঠুরতা। পুরো শহরের মানুষকে কঠিনভাবে এভাবে অবরুদ্ধ করে ফেলা আমরা মেনে নিতে পারছিলাম না। মায়াকান্নাটা আমাদের বেশি, সেজন্য পুরো ঘটনা সম্পর্কে না-জেনেই মনে করেছিলাম চীন নিষ্ঠুর আচরণ করছে তার নাগরিকদের সঙ্গে। বলা হল, চীন সরকার কীরকম নিষ্ঠুর, চিকিৎসার নামে পুরো একটা শহরের মানুষকে বন্দি করে রেখেছে। চীনের স্বৈরাচারী শাসনের স্বরূপ নিয়ে সারাবিশ্বে তখন সমালোচনা আরম্ভ হল। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যত দেশের মানুষরা তখন উহানে ছিল বা যারা পড়াশুনার জন্য গিয়েছিল, সকলের তাদের আহাজারি শোনা গেল, শহরটাকে বন্দি করে চীন সরকার তাদের জীবনটা অনিশ্চিত করে ফেলেছে। মৃত্যুপুরীর মধ্যে তাদের বন্দি করে রেখেছে। ব্যাপারটা নিশ্চয় তেমন ছিল না। কিন্তু প্রচারগুলো ছিল খুব নেতিবাচক।

বিভিন্ন ধরনের খবর আসছিল তখন চীনের উহান সম্পর্কে, যার মধ্যে সকলে কমিউনিজমের ভূত দেখতে পেয়েছিল। সরকার মানুষগুলোকে বন্দি করে রেখেছে, খাবার দিচ্ছে না ঠিকমতো। সপ্তাহে যে খাবার দেয়া হচ্ছে সেটা পরিমাণে অনেক কম। চীনের যেসব খাবার দেয়া হচ্ছে তা খাওয়া যায় না। খাদ্য কেনার জন্য আবার ঘর থেকে বের হতে দিচ্ছে না। বিশ্বের জন্য করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ভয়াবহ কতটা বিপজ্জনক হতে পারে সে-খবরটাকে কম গুরুত্ব দিয়ে, চীনের শাসকদের দমন-পীড়নের কথাগুলোই বেশি বলা হল। কখনো এ ইঙ্গিতটা দেয়া হল না যে, সকল নিষ্ঠুরতার পরেও উহানেই যদি এ ভাইরাসকে নির্মূল করা সম্ভব হয় সারা বিশ্বই তাতে লাভবান হতে পারে। কিন্তু সকল রাষ্ট্র চাইলে করোনা সঙ্কটের সমাধান তখনি হতে পারত। যদি উহান থেকে এ ভাইরাসের উৎপত্তি হয়ে থাকে, সেটা উহানের মধ্যে আটকে রেখে নির্মূল করার পদক্ষেপই ছিল সবচেয়ে সঠিক। পাশাপাশি ইতিমধ্যে যেসকল নাগরিক উহান ভ্রমণ-শেষে বিভিন্ন দেশে ফিরে গেছে তাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। সকল সরকার তাদের নিজ নিজ দেশে কড়া নজরদারিতে রাখলে, তাদের সংক্রমিত হতে দেখলে তার প্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই সংক্রমণের সমাপ্তিটা সেখানেই ঘটতে পারত। কিন্তু কারো পক্ষেই তখন করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়নি, বিশ্বের জন্য তা কী পরিণতি ডেকে আনতে পারে তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়নি। চীন যে মহামারির হাত থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেটাও বোঝা সম্ভব হয়নি। ফলে বিভিন্ন সমালোচনার মুখে চীন উহানে অবরুদ্ধ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সেসব দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করল। বাংলাদেশে ফিরে এল অনেকে। নিশ্চয় এখন তারা টের পাচ্ছে উহানে থাকা সঠিক ছিল, নাকি এই ফিরে আসাটা।

করোনা ভাইরাস নিয়ে চীন সম্পর্কে নানারকম মুখরোচক গল্প পরেও শোনা গেছে। কিন্তু বাস্তব সত্যটি হল, চীনই করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রথম সঠিক পদক্ষেপটি নিয়েছিল। বিশ্বের বহু রাষ্ট্রই এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের অযোগ্যতা প্রমাণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রই এখন সবচেয়ে ভয়াবহ-রকম করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত, মৃতের সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি সেখানে। কারণ রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প প্রথমে কিছুতেই চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কথা শুনতে চাননি। ট্রাম্পের জেদই যুক্তরাষ্ট্রকে ভয়াবহ বিপদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রেই শুধু করোনায় আক্রান্তদের সংখ্যা সারা পৃথিবীর আক্রান্তদের প্রায় এক-চতুর্থাংশের বেশি। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে মানুষের মৃতের ক্ষেত্রেও তাই। বর্তমানে এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে, করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতার কথা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানরা জানতেন। কিন্তু খবরটা তাঁরা গোপন করেছিলেন। নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থেই রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সহ বড় বড় ব্যবসায়ীরা তা চেপে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁদের ভয় ছিল, খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়লে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে ধস নামবে। ট্রাম্পের নিজেরই বিরাট ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য রয়েছে। ফলে শেয়ারবাজারে নিজেদের শেয়ারের দাম ঠিক থাকতে থাকতে সেগুলোর একটা বিলিব্যবস্থা করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে নীরব রইল। বরং ট্রাম্প বলে বেড়ালেন, এটা একটা সাধারণ ফ্লু। কিছুদিন আবার চীনকে দোষারোপ করলেন। কিন্তু এখন বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ করছে, ট্রাম্প ইচ্ছাকৃতভাবে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের পদক্ষেপ নিতে দেরি করাতে যুক্তরাষ্ট্রে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং ইতিমধ্যেই এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষ মারা যায়। ধনীক দেশগুলোর কাছে আসলে আগে নিজেদের মুনাফা, তার জনগণের জীবনের মূল্য। নিজেদের মুনাফার স্বার্থে লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যুপথে পাঠাতে তাদের মনে সামান্য দ্বিধা নেই। যুক্তরাষ্ট্র তা স্পষ্টভাবেই তা প্রমাণ করেছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এবং বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ঠিক একইভাবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবেলায় যথাসময়ে সতর্ক হতে পারেনি। বাংলাদেশ বছরের শুরু থেকেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মদিন বছরব্যাপী পালনের কাজে ব্যস্ত ছিল। করোনা ভাইরাস সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যে সময় হাতে পাওয়া গিয়েছিল ফলে তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়নি। মনে করা হয়েছিল বাংলাদেশে সেরকমভাবে করোনা-র আক্রমণ হবে না। কয়েকজন মনীষী বলেছেন, করোনার সঙ্গে লড়তে করোনা-র আগে হাঁটতে হবে, পিছনে নয়। কিন্তু প্রায় সকলেই করোনার পিছনে হেঁটেছে। করোনা ভাইরাস আক্রমণের আগে সেভাবে সতর্কতা বা প্রস্তুতি নেয়নি। কিন্তু দরকার ছিল করোনা-র আক্রমণের আগে প্রস্তুত থাকা। করোনা-র আক্রমণ ভয়াবহ হতে পারে ধরে নিয়ে যারা প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল, সেসব দেশ যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে নিজের দেশের পরিস্থিতিকে। বাংলাদেশ যে প্রস্তুত ছিল না সেটা নির্দ্বিধায় যেমন সত্য, ঠিক তার চেয়ে বেশি সত্য করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি বলতে কী বোঝায়, সেটাই স্পষ্টভাবে সংশ্লিষ্টদের ধারণায় ছিল না। মন্ত্রী থেকে সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীরা তবুও বলেছিলেন, যে তাঁদের যথেষ্ট প্রস্তুতি আছে এমনকি বড় বড় অনেক দেশের চেয়েও। দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নানারকম ব্যর্থতার পরেও বলেছেন, জানুয়ারি মাস থেকেই নাকি তাঁরা যথাযথ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। মন্ত্রীর এমন বক্তব্যে বোঝা যায়, ক্ষমতায় বসে নিজেদের দোষ স্বীকার করতে শিখিনি আমরা, বিনয় শিখিনি, মহাবিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে পর্যন্ত সত্য বলতে শিখিনি। জীবনের সবটাই আমাদের লুকোচুরি। কিন্তু আমরা দেখেছি ডোবারস্ট্রাইন বলেছেন, ভাইরাস আক্রমণ প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশি দরকার স্বচ্ছতা।

করোনা সংক্রমণের বিষয়টার গুরুত্ব অনুধাবন করতে দেখা যায়নি দায়িত্বশীল বেশিরভাগ মানুষকে। যাঁরা সমাজের অগ্রগামী ছিলেন, যাঁরা বিভিন্ন পেশার কর্ণধার ছিলেন সকলেই চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। যখন ইতালি, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র ভয়াবহ সংক্রমণের শিকার, যখন সৌদি আরব কাবাঘর বন্ধ করে দিয়েছে তখন সব দেখেও গা না-করাটা খুব লজ্জার। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কর্ণধারেরা চরম অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা এখন পদে পদে প্রমাণিত। সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পরেও তাদের নির্বিকার থাকার পরিণতি রাষ্ট্র এখন টের পাচ্ছে। বিগত প্রায় তিন মাস পার হবার পর চিকিৎসা ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা বা লজ্জাজনক অব্যবস্থাপনার কারণে বহু রোগী হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েছে পর্যন্ত। যারা হাসপাতালে আছেন তারা চিকিৎসা পাচ্ছেন না। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য বহু রোগী বিভিন্ন হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরে নিজে আশ্রয়ে ফিরে গেছে, বুঝতে পারেনি এখন আর কী করতে হবে। বহু জন হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে চিকিৎসার সামান্য সুযোগ না পেয়ে মারা গেছেন পথিমধ্যে। বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া কী দুর্ভাগ্যজনক তাদের জন্য! বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান মহাসচিব এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডা. ইহতেশামুল হক চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশে প্রথম রোগটি ধরা পড়ে ৮ মার্চ। ঠিক এর তিন মাস আগে ধরা পড়ে চীনের উহানে। ইতিমধ্যে আরো তিন মাস পার হয়ে গেছে। ৮ মার্চের আগের তিন মাস আর পরের তিন মাসের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করে বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যবিভাগ চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রথম তিন মাস আমাদের স্বাস্থ্যবিভাগ তো পাত্তাই দেয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলল টেস্ট টেস্ট এবং টেস্ট। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান দুই হাজার কিট নিয়ে বলল, 'আমরা প্রস্তুত'।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসা দেবার ব্যাপারে চরম দায়িত্বহীনতা দেখিয়েছেন আইইডিসিআর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তারা; করোনা ভাইরাস সংক্রমণের মতো ভয়াবহ বিষয়টাতে যেন তাঁরা হেসে-খেলে আর বড় বড় কথা বলে সামাল দিতে চেয়েছেন। যা তাঁরা বড় মুখ করে বলেছিলেন, কিছুই কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করতে পারেননি। বরং নিজেদের পুরনো দোষ আর অযোগ্যতা চাপা দেয়ার জন্য, বর্তমানেও নানারকম সব কৌশল নিচ্ছেন যা দিনে দিনে বিপদ বাড়িয়েই তুলছে। নিজেদের সকল দোষ 'জনগণের অসচেতনতার নামে' ম্লান করে দিতে চাইছেন। সত্যি বলতে তাঁদের ভুলের মাশুল দিয়ে গিয়ে চিকিৎসকেরা অনেক বেশি সংখ্যায় করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। বিএমএ-র মহাসচিব ইহতেশামুল এ সম্পর্কে সম্প্রতি যা বলেছেন তা দুঃখজনক। তিনি বলেন, সরকারের কার্যক্রমে শুরু থেকেই চিকিৎসকরা খুবই বিরক্ত ছিল। তাঁদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর নামে রেইনকোট পরানো হয়েছে। সেটা পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘামে ভিজে চিকিৎসকেরা দায়িত্ব পালন করেছেন। নকল এন-৯৫ মাস্ক দেওয়া হয়েছে। থাকার জায়গা নিয়ে নানারকম জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব নিয়ে কথা বলায় কয়েকজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একদিকে তাঁদের সম্মুখসারির যোদ্ধা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তাঁদের সুরক্ষা সামগ্রী দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করা হয়েছে। এর ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের প্রায় তিন হাজার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত এবং তাঁদের মধ্যে এক হাজার জনই চিকিৎসক।

করোনা ভাইরাসের আক্রমণের প্রস্তুতি মানে শুধু চিকিৎসাসেবা দান নয়। ইতালি আর স্পেনের দিকে তাকিয়ে মাথায় রাখা দরকার ছিল, চিকিৎসকরা আর চিকিৎসাকর্মীরা সেবা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হলে কী করতে হবে। মাথায় রাখা দরকার ছিল, যখন সংক্রমণের সংখ্যা বাড়বে, বহু চিকিৎসক আর হাসপাতালগুলো ভয় পেয়ে সাধারণ রোগীদেরকেও আর চিকিৎসা দিতে চাইবে না। সকলের মৃত্যুভয় আছে আর নিজ হাসপাতালে কেউ রোগ ছড়াতে চাইবে না। ফলে করোনা আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি মানে সবকিছু মাথায় রেখে সামগ্রিকভাবে প্রস্তুতি। কিছুতেই যেন সারা দেশের চিকিৎসাসেবা বন্ধ না হয় তার প্রস্তুতি। কিন্তু সেরকম প্রস্তুতি মাথায় রাখা হয়নি, ফলে করোনায় আক্রান্ত না হয়েও বিভিন্ন রোগে বিনা চিকিৎসায় বহু মানুষ মারা পড়ছে। করোনা-র প্রস্তুতি মানে, করোনায় আক্রান্তদের জন্য হাসপাতাল সংখ্যা বাড়ানো, চীন রাতারাতি সে উদাহরণ রেখে গেছে। ফলে শুধুমাত্র করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের সেবা দেয়ার জন্য হাসপাতাল বাড়ানো দরকার ছিল। বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনেক। ফলে আক্রান্তের সংখ্যা বিরাট আকার নিতে পারে সে বিবেচনা থেকেই হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ানো দরকার ছিল। পাশাপাশি করোনা ভাইরাসের রোগনির্ণয় কেন্দ্র আর তার সুবিধা যথেষ্ট বাড়ানো আবশ্যক ছিল। সেসব কিছুই করা হয়নি, কিন্তু বলা হয়েছে সবরকম প্রস্তুতি আছে। চিৎকার করে এখনো যেন সে কথাটাই বলার চেষ্টা করছে চিকিৎসা-সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা।

রাষ্ট্রের প্রস্তুতি মানে শুধু রোগ নির্ণয় আর চিকিৎসা দানের প্রস্তুতি নয়। করোনা-র আক্রমণের ফলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রের ভিতরে আর যা যা ঘটতে পারে বা ঘটবে তার সবকিছুর জন্য প্রস্তুতি। বিশেষ কোনো মন্ত্রণালয় নয়, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার ছিল এর জন্য। যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, স্পেন যে সুযোগ পায়নি, সে সুযোগগুলোও আমরা পেয়েছিলাম; কারণ এখানে আক্রমণ হয়েছে অনেক পরে। কিন্তু সুযোগ পেয়েও সঙ্কট সমাধানে ন্যূনতম পরিকল্পনা নেয়া হয়নি, করোনা-র আক্রমণ হলে কীভাবে তা সামাল দেয়া হবে বা আক্রমণের আগেই কীভাবে তা প্রতিরোধ করা যাবে। কিছু তাৎক্ষণিকভাবে বিশৃঙ্খল কার্যক্রম পালিত হয়েছে। চারদিক থেকে যখন লকডাউনের কথা বলা হচ্ছিল, সরকারের পরিকল্পনা কী জানা যায়নি। বিভিন্নরকম চাপের মুখে সরকার প্রথম ছুটি ঘোষণা করল মানুষদের ঘরে রাখবার জন্য। রাতারাতি মানুষকে ঘরে ঢুকতে বললেই যে তাঁরা ঘরে ঢুকে যাবে না, সেটাই তো বাস্তবসম্মত। বিশেষ করে বাংলাদেশ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র নয় যে, দুর্দিনে রাষ্ট্র তার খাওয়া-পরার সব দায়িত্ব নেবে আর মানুষ নিশ্চিন্তে ঘরে গিয়ে বসে থাকবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র কি তার বিরাটসংখ্যক বেকার, অনিয়মিত উপার্জনকারী আর পুষ্টিহীন নাগরিকদেরকে চেনে না, তাদের বাস্তব অবস্থা জানে না? সমাজে যারা ধনী চাইলেই তারা তিন-চার মাসের হাটবাজার করে ঘরে ঢুকে যেতে পারে? সকল মানুষের কি সেই সুবিধা আছে? বাংলাদেশের সকল মানুষের কি ঘর আছে? যাদের সামান্য থাকার ব্যবস্থা আছে, তাদের ঘরের পরিবেশ কী? বাংলাদেশে কজন মানুষ নিজ ঘরে আলাদাভাবে থাকার সুবিধা ভোগ করে? কতজন রাস্তায় আর স্টেশনে ঘুমায় দিনের পর দিন মাসের পর মাস, রাষ্ট্র কি তা জানে না?

সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর যদি পূর্ব থেকেই গোছানো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকত বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো পরেও যদি এ ব্যাপারে আন্তরিক হতেন, তা হলে দেশের সকল হোটেলগুলো সাময়িকভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যেতে পারতেন। করোনায় বিভিন্নভাবে আক্রান্তদের সেখানে আইসোলেশনে রাখা যেত যাতে করে তারা আর রোগ না-ছড়ায়। বিশেষ করে প্রথমদিকে বিদেশ থেকে আগতদের ক্ষেত্রে এরকম করাটা খুবই বাস্তবসম্মত একটা কাজ হত। পরবর্তীতে আক্রান্ত অন্যদের ক্ষেত্রেও তা ব্যবহার করা যেত। চিকিৎসকেরা কর্তব্যপালন শেষে দরকারে পরিবারের কাছে না-গিয়ে হোটেলগুলোতে থাকতে পারতেন, যাতে তাঁদের মাধ্যমে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রোগ ছড়িয়ে না-পড়ে। কর্মরত আরো অনেকের ক্ষেত্রে এটা করা দরকার ছিল। বড় বড় হোটেল, মধ্যম মানের হোটেল, সাধারণ হোটেল সকল হোটেলগুলোকে এ এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেত। বহু তরুণ চিকিৎসকদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে, বহু চিকিৎসকের বৃদ্ধ বাবা-মা আছেন, যদি চিকিৎসকদের পছন্দ থাকত

তাহলে তাঁরা বাসায় না-গিয়ে হোটেলে থেকে যেতে পারতেন। নিশ্চয় তাঁরা সেক্ষেত্রে অনেক বেশি মানসিক প্রশান্তি লাভ করতেন। বাংলাদেশের বহু মানুষের বাড়িতে রুম-সংখ্যা কম, অনেক মানুষ দুটো বা একটা কক্ষে ভাগাভাগি করে থাকে। যদি সেসব পরিবারের কেউ আক্রান্ত হলে তাদের হোটেলে এনে রাখা যেত, নিশ্চয় রোগ কম ছড়াত। সবচেয়ে বেশি যা দরকার ছিল, সামান্য সন্দেহে যে-কারো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ থাকা– যা একেবারেই ছিল না। ফলে দু'মাসের ছুটি খুব বেশি সুফল দিতে পারেনি। কীভাবে সুফল লাভ করা যায় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর কোনো ভূমিকা বা আন্তরিকতা ছিল না। সঠিক কোনো পরিকল্পনাই তারা নিতে পারেননি। বরং অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে আমলারা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। চিকিৎসকেরা ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ তুললে তাঁদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, অন্যায়ভাবে তাঁদের শাস্তি দিয়ে নিজেদের জুলুম প্রতিষ্ঠা করেছে। মনে হয়েছে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটা যেন আমলা দ্বারা পরিচালিত, জনগণের সেবক কখনো মনে হয়নি।

বাংলাদেশের জন্য লক-ডাউন না করার সিদ্ধান্ত হতে পারত সবচেয়ে সঠিক যদি প্রথম থেকে অন্যান্য বিষয়গুলোর দিকে সংশ্লিষ্টদের সঠিকভাবে নজর থাকত। বাংলাদেশের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল, যদি পূর্ব থেকেই সব পরিকল্পনা নেয়া হত। কারণ বাংলাদেশ হাতে যথেষ্ট সময় পেয়েছিল। বাইরে থেকে আগত সাত লক্ষ মানুষকে লক-ডাউন করে রাখলে, সতেরো কোটি মানুষকে লক-ডাউন বা গৃহবন্দি না-করলেই চলত। পরিকল্পিতভাবে পদক্ষেপ নিয়ে বাইরে থেকে আসা এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের কয়েকটি শহরের মধ্যে বিশদিনের জন্য আটকে দেয়া যেত। সরকারের দু'মাসের ছুটি ঘোষণা মানুষকে গৃহবন্দি করার ফলে ইতিমধ্যেই যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়ে কম খরচে এটা করা যেত। কিন্তু সেরকম পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো। কার ক্ষতি হল এখন, অর্থনীতি ভেঙে পড়ার ফল পুরো জাতিকে ভোগ করতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হচ্ছে গ্রাম এবং চাষাবাদ। গ্রামগুলোতে যাতে করোনা-র আক্রমণ ছড়িয়ে না-পড়ে, চাষাবাদ বাধাগ্রস্ত না-হয় তা নিয়ে কি কোনো ধরনের পরিকল্পনা ছিল? সবার আগে দেশের অর্থনীতিকে বাঁচাতে হয়। গ্রামগুলোতে সন্দেহজনক সংক্রমিতদেরকে প্রবেশ করতে না-দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল কি? ভিয়েতনাম সেটা করেছে। হয়তো আরো দেশ করেছে, যাদের খবর জানি না। নিশ্চয় বাংলাদেশের জন্য এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন। কিন্তু সেই কঠিন সিদ্ধান্তটা নেয়ার মতো সময় আমাদের হাতে ছিল।

লক-ডাউন দরকার ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেজন্য রাষ্ট্রের জরুরি বিভাগ আর চাষাবাদ এবং অর্থনীতির প্রধান দিকগুলো সচল রেখে, সকল দিক সামাল দিয়ে যথাযথ সুফল পেতে পরিকল্পিতভাবে লক-ডাউন আরম্ভ করা যেতে পারত। কিন্তু বাংলাদেশ লক-ডাউন ঘোষণা না-করে ছুটি ঘোষণা করেছিল। সরকারের এই ছুটি ঘোষণার ব্যাপারটা মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করেছে। ব্যাপারটা কি লক-ডাউন নাকি লক-ডাউন নয়, সে নিয়ে সব মহলে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সরকার কখনো লক-ডাউন না-বলে বার বার ছুটি বাড়িয়ে ব্যাপারটা দু'মাসের বেশি সময় ধরে চালিয়ে গেছে। কিছু মানুষ এই সময়টাকে লক-ডাউন ভেবেছে, কিছু মানুষ বুঝতেই পারেনি কী ঘটছে। কয়েক দফায় দু'মাস ছুটি দিয়ে সরকার কী ফলাফল অর্জন করতে চেয়েছে, সুনির্দিষ্ট করে এখনো কেউ বলতে পারবে না। চীন একটা শহরকে লক-ডাউন করে বাকি শহরের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রেখেছিল। করোনা ভাইরাসে প্রথম আক্রান্ত দেশ চীন প্রথমেই বুঝেছিল, সারা চীনকে লক-ডাউন করতে হলে সারা দেশের অর্থনীতি আর উন্নয়ন ধসে যাবে। করোনা-র হাত থেকে তাতে মুক্তি আসলেও মানুষ মারা যাবে না-খেয়ে, জীবনধারণের বস্তুগত সুবিধা হারিয়ে। সারা দেশ জুড়ে দেখা যাবে বিশৃঙ্খলা আর হতাশা। সুদূরপ্রসারী চিন্তা ছিল সেটা। ফলে একটা শহরের মধ্যে করোনাকে প্রবলভাবে আটকে রেখে ছাড়া দেশকে বাঁচাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল তারা। চীন সেটা করেই খুব স্বল্প সময়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পেরেছে।

বাংলাদেশের সরকারি লোকেরা অনেকে পরিশ্রম করেছেন, অনেকে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছেন কিন্তু সঙ্কটটা ছিল সঠিক পরিকল্পনার। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না-থাকায় সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ বিভাগের সদস্যরা অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয়েছেন। ভিন্ন দিকে সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণে যেমন রাখা যায়নি, এমনকি তার যথাযথ হিসাবটা পর্যন্ত রাখা সম্ভব হয়নি। নিশ্চয় এই ব্যর্থতাগুলো সকলের নয়, সর্বোচ্চ মহলের। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্তুতি কোনো ছেলেখেলা নয়। প্রথম মাথায় রাখা দরকার ছিল, লক-ডাউন করা হবে কি হবে না। যদি তা করা হয় তবে কারা স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি থাকবেন আর কারা নয়। খুব সহজ কথা, সকলে গৃহবন্দি হলে তো রাষ্ট্র অচল হয়ে যাবে। সবকিছুর শুরু থেকেই এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা, হিসাব আর পরিসংখ্যান করা দরকার ছিল। চাষাবাদের মানুষজনকে কি সত্যিই গৃহবন্দি করে রাখা যাবে? রাখা গেলে কতদিন? দোকানদারদের কি গৃহবন্দি করে রাখা যাবে? বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদকদের কি গৃহবন্দি থাকতে বলা যাবে? যাঁদের গৃহবন্দি করা যাবে না, রাষ্ট্র সম্পূর্ণ অচল না-করে যাঁদের মাধ্যমে রাষ্ট্র সচল রাখতে হবে তাঁদের ব্যাপারে কী উদ্যোগ নেওয়া হবে? ভিন্ন দিকে যাঁরা গৃহবন্দি হবেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা দিনে আনে দিনে খান বা যাঁরা মাসের সামান্য বেতনে চলেন, তাঁদের কী হবে; কী পদ্ধতিতে তাঁরা গৃহবন্দি থাকবেন, তাঁদের খাবারদাবারের ব্যবস্থা কী হবে; রাষ্ট্র কি তা ভেবে রেখেছিল? বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ কোনো জেলায় বা দু-একটা অঞ্চলে বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে যেখানে মানুষের কাছে ত্রাণসামগ্রী ঠিকমতো পৌঁছায় না, সারা দেশের বিরাটসংখ্যক মানুষকে সেখানে যদি ত্রাণ দিতেই হয়, ত্রাণসামগ্রী পৌঁছাবার উপায় কী হবে?

নিশ্চিতভাবে তা জনগণের হাতে যাবে কিনা সে নিয়ে কি উৎকণ্ঠা ছিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কর্ণধার আর উপদেষ্টাদের? সাধারণ মানুষকে এত কিছু না-বুঝলেও চলে, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধারদের, রাষ্ট্রের উপদেষ্টাদের এসব বুঝতে হয়।

বাংলাদেশ তখনো সংক্রমিত হয়নি, ফেব্রুয়ারি মাসে। ফলে মানুষের তখন আতঙ্কিত হবার কিছুই ছিল না। যদি তখন মানুষকে বলা যেত যে, "সামনে একটা ভয়াবহ বিপদ আসবার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আমরা সতর্ক হই তাহলেই রক্ষা পাব। দু-একজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ধরা পড়লেই আমাদের অনেককে গৃহবন্দি হতে হবে। সেটা হলে বিপদ আর বেশি বাড়বে না। যদি গৃহবন্দি হতে হয়, যাদের খাবারদাবার থাকবে না, সরকার তাদের খাবার পৌঁছে দেবে।" সরকারের তাহলে প্রস্তুতি থাকত, মানুষও প্রস্তুতি নিয়ে রাখত। মানুষ আগে থেকেই একটা পরিকল্পনা নিতে পারত, সেরকম পরিস্থিতি হলে কী করবে। যারা গ্রামে যেত, রাতারাতি হৈ-হুল্লোড় করে যেতে হত না। সংক্রমণ ছড়াতে পারত না। গ্রামে গেলে সংক্রমণের আগেভাগেই চলে যেত। যদি বহু আগে থেকে সে পরিকল্পনা থাকত, তাহলে বিদেশ থেকে যাঁরা আসছেন, তাঁদের ব্যাপারেও কীভাবে কী করা হবে সে পরিকল্পনাটাও থাকত। কিন্তু কারো কোনো পরিকল্পনা ছিল না। যখন করোনা ভাইরাসের আক্রমণে চীনের পর ইতালি, স্পেন দিশেহারা হয়েছিল, বাংলাদেশের সকল টেলিভিশনগুলোকে কাজে লাগানো যেত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য। দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মানুষকে সচেতন করলে মানুষ সচেতন হবে না, সেটা কি বিশ্বাস করতে হবে? কিন্তু সেটা আমরা করেছি কি না? না করেই জোর দিয়ে বলছি কী করে যে, 'মানুষ সচেতন নয়'? যাঁরা দেশের কর্ণধার, তাঁরাই তো বিশ্বাস করেননি করোনা-র ভয়াবহ রূপটা কী হতে পারে। ফলে জনগণকে বিশ্বাস করানোর প্রচেষ্টাও ছিল না।

বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে গণমাধ্যমগুলোর ব্যর্থতা খুবই দুঃখজনক। সাধারণ মানুষের কাছে করোনা কী কখনোই তারা স্পষ্ট করে বলতে পারেনি। মানুষ কেন হাত ধোবে, কেন ঘরে থাকবে কীভাবে করোনার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে, এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জনগণকে সচেতন করতে পারেনি গণমাধ্যমগুলো। গণমাধ্যম যা কিছু করছে ভদ্রলোকদের জন্য, সুবিধাভোগীদের কথা চিন্তা করে। কিন্তু সেটাও সফলভাবে করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশে এ যাবৎ করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে যত আলোচনা সব সুবিধাভোগীদের জন্য। সবাই বলছে করোনা-র হাত থেকে বাঁচতে হলে পুষ্টিকর আমিষ জাতীয় খাবার খেতে হবে, বেশি বেশি টাটকা ফল আর সবজি খেতে হবে, দুধ খেতে হবে। বাংলাদেশের বিরাট সংখ্যক নিম্নবিত্ত এবং প্রান্তিক মানুষের এসব খাবার সামর্থ্য কি আছে? ফলে তাদের ওইসব পরামর্শ কাদের জন্য, দেশের কত শতাংশ মানুষের জন্য? টাটকা ফল আর পুষ্টিকর আমিষ কজন খাবার ক্ষমতা রাখে? বরং বলা যায়, দরিদ্র মানুষের এখন দুবেলা সঠিকভাবে ডাল-ভাত জোটে না। করোনা ভাইরাসটি আসলে কী, কীভাবে রোগ ছড়ায় আর মানুষ কীভাবে কী করলে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে; প্রান্তিক মানুষের বোধগম্য ভাষায় তা প্রচার করা দরকার ছিল। কিন্তু করোনা আক্রমণের আড়াই মাস পরেও সাধারণ মানুষ দূরের কথা, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও জানেন না, করোনা কীভাবে কোন্ কোন্ কানাগলি দিয়ে সংক্রমণের শিকার হতে পারে। ফলে তাঁদের অনেকেই ঘরে বসে থেকেও করোনা বাধিয়ে বসেছেন। এতদিন পরা বলা হচ্ছে, ঘরের রেফ্রিজারেটর থেকেও নানাভাবে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ হতে পারে বা করোনা রোগ ছড়াতে পারে। এসব কথা তো প্রথমেই বলে মানুষকে সতর্ক করা যেত।

বাংলাদেশের প্রচারমাধ্যমে ইতিমধ্যেই নানারকম সময়ে বলা হয়েছে, করোনা-র ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। সারাবিশ্বে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কোনো ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো তার স্বঘোষিত ওষুধ আবিষ্কারকে খুব উত্তেজনার সঙ্গে ফলাও করে প্রচার করেছে। সত্যিই সেসব আবিষ্কার কতটা বিজ্ঞানসম্মত বা গবেষণা দ্বারা গ্রহণযোগ্য সে বিচার-বিশ্লেষণে না-গিয়ে ব্যাপকভাবে তা প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, বহু ওষুধ যা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পরীক্ষিত নয় বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির স্বার্থে সেগুলোর পক্ষে প্রচার চালানো হয়েছে গণমাধ্যমে। কারণ সে ওষুধগুলো সংবাদমাধ্যমগুলোর মালিকদের প্রতিষ্ঠানের। সারা পৃথিবী যখন বলছে করোনা-র চিকিৎসার জন্য সুনির্দিষ্ট ওষুধ নেই, তখন বাংলাদেশ কী করে ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে বা ওষুধ আছে সে-কথা বলছে? জাপান থেকে আবিষ্কৃত যে ওষুধকে জাপান নিজে করোনা-র ওষুধ বলছে না, বাংলাদেশের ওষুধনির্মাতা প্রতিষ্ঠান সেগুলোকে কীভাবে করোনার ওষুধ হিসেবে প্রচার চালাচ্ছে? মালিকদের মুনাফার স্বার্থে গণমাধ্যমগুলো জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে এসব কাজ করেছে। বাংলাদেশের সুবিধাভোগী একটি গোষ্ঠী এখনো করোনা-র ভয়াবহতাকে আমলে নিচ্ছে না, নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য আর মুনাফা বাড়াবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। নিজেদের ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধাকে বড় করে দেখছে। যখন ওষুধ তৈরির প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, করোনা-র ওষুধ আছে আর তাতে মানুষ সুস্থ হয়ে যাবে, তখন খুব স্বাভাবিক, সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কী করে করোনা-র ভয়াবহতা হৃদয়ঙ্গম করবে? মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন ওষুধগুলোর পক্ষে প্রচার চালিয়ে গণমাধ্যমগুলো এর দ্বারা নিজেদের চরিত্র স্পষ্ট করে তুলেছে। নিশ্চয় গণমাধ্যমগুলোর অনেক ইতিবাচক দিকও রয়েছে। গণমাধ্যমগুলোর শুধু খারাপ দিক আছে আর ভালো দিক নেই, ব্যাপারটা এমন তো নয়। কিন্তু তাদের ক্ষতিকারক ভূমিকাগুলো আলোচনায় আসা দরকার।

বহু জন মনে করছেন, সাধারণ মানুষেরা লক-ডাউন পালন করছে না বলে সংক্রমণ বাড়ছে। সাধারণ মানুষ কেন লক-ডাউন পালন করতে পারছে না, সে বিবেচনায় তারা যাচ্ছেন না। শিক্ষিত বা সুবিধাভোগী এসব মানুষের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে ধারণা খুবই সেকেলে আর নেতিবাচক। সকল মানুষকে মর্যাদা দেবার সংস্কৃতি তাদের মানসিকতায় এখনো গড়ে ওঠেনি। ভদ্রলোকেরা নিজেরা অনেকে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছেন, নিশ্চয় সেটা সংক্রমণ কম ছড়াতে সাহায্য করেছে। ভদ্রলোকেরা নিজেদের স্বার্থে সেটা করলেও, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এর যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি অনেক সুবিধাভোগী সুযোগসন্ধানীরা ঠিক বিপরীত আচরণ করেছেন। বিভিন্নভাবে দেখা গেছে, বহু জন প্রশাসন চালাবার নামে দলবল নিয়ে আসর জমাচ্ছেন নিজেদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, বহুজন ত্রাণ বিতরণের নামে বহু মানুষের ভিড় জমিয়ে তুলেছেন সেটার প্রচার বাড়াবার জন্য। নিশ্চয় তা সংক্রমণ বাড়তে সাহায্য করেছে। এঁরা তো লেখাপড়া-জানা, তথাকথিত শিক্ষিত ক্ষমতাবান মানুষ। নিশ্চয় এক্ষেত্রে পোশাকশিল্পের মালিকদের উদাহরণটা টানতেই হয়। মালিক পক্ষ একদিকে বলেছে, তাদের সকল অর্ডার বাতিল হয়ে গেছে ফলে শ্রমিকদের বেতন দেয়া সম্ভব নয়। ভিন্ন দিকে আবার শ্রমিকদের কারখানায় কাজ করতে বাধ্য করেছে। যদি বিদেশের সকল অর্ডার বাতিল হয়ে গিয়ে থাকে শ্রমিকদের কাজ করতে হবে কেন? প্রধানমন্ত্রী নিজে গত এপ্রিলের এগারো পর্যন্ত ছুটি ঘোষণার পর যা তাঁরা কী করেছেন? লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে কাজে যোগদান করার আদেশ দিয়ে বিপদে ফেলেছেন। সত্যিই কি তারপর বলতে হবে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার দায় শ্রমিকদের বা সাধারণ মানুষদের? দায়-দায়িত্ব পুরোটাই সুবিধাভোগী ভদ্রলোকদের। সরকারের কি এসব ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট নীতিমালা ছিল? সরকারের ভূমিকা এক্ষেত্রে রহস্যজনক ছিল।

বাংলাদেশের সেই দুর্দিনে, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়াবার সেই প্রথম দিনগুলোতে অনেকের সঙ্গে আমিও বিশ্বাস করেছি, সবচেয়ে প্রয়োজন বেশিরভাগ মানুষের গৃহবন্দি থাকা। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বিশ্বাস করতাম, সরকারের দিক থেকে এর জন্য অত্যাবশ্যকভাবে পালনীয় কিছু শর্ত রয়েছে। সে-সকল শর্ত পালিত না-হলে মানুষকে গৃহবন্দি করা যাবে না। প্রধান শর্তটি ছিল, গৃহবন্দি থাকাকালীন অবস্থায় নিম্ন আয়ের মানুষদের ঘরে ঘরে খাবার সরবরাহ করা। সরকারি কর্মকর্তাদের একজনকে দেখলাম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনলাইন আলোচনায় তখন প্রস্তাব করেছেন, টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে আরো বিনোদন দিতে হবে, যাতে মানুষ ঘরে আটকে থাকে। তিনি বিনোদন বলতে যে কী বোঝেন সেটা একটা দুর্বোধ্য বিষয় হয়ে রইল। টেলিভিশনে বিনোদন দেয়ার আগে গৃহবন্দি অসহায় মানুষকে খাবার পৌঁছে দেয়া দরকার ছিল। কিন্তু সেটা আসলে করা হয়নি। নিজে আমি যেসকল দরিদ্র গৃহবন্দি মানুষকে চিনি তারা কেউই সরকারি সাহায্য পায়নি। বিভিন্ন বাম রাজনৈতিক দলের কর্মীরা, বা বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাদের খাদ্য জোগান দিয়েছিল এবং দিয়ে যাচ্ছে। যেসকল দরিদ্র কর্মজীবী মানুষ এ মুহূর্তে গৃহে বন্দি আছেন বা ছিলেন তাদের থাকা-খাওয়া নিশ্চিত করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সরকার কিছু লোককে কিছু সাহায্য দিয়েছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সেটাকে সাহায্য দেয়া হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। কারণ সাহায্য পেতে হবে রাষ্ট্রের প্রতিটি দরিদ্র নাগরিককে। সরকারের স্মরণ রাখা দরকার ছিল, সার্বিক অর্থনীতির বড় সৈনিক দরিদ্র খেটে-খাওয়া মানুষরা। চিকিৎসকদের দায়িত্ব তখন অনেক কমে যাবে, কর্মজীবী মানুষের দায়িত্ব বাড়বে। ফলে তাঁরা যেন সুস্থ থাকেন, সুগঠিত থাকেন সেটা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সরকার যথাযথ উদ্যোগ নিতে পারেনি। বাংলাদেশের সরকারগুলো অবশ্য কখনো নিজেদের এসব ব্যর্থতা স্বীকার করতে রাজি নন। বরং সরকারের লোকেরা এ ধরনের সমালোচনা পছন্দ করেন না। সবসময় নিজেদের সব কাজের প্রশংসা শুনতে চান।

চিকিৎসকরা লড়ছেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধে। সামান্য কিছু দোষ-ত্রুটি বাদ দিলে চিকিৎসকেরা সাহসী ভূমিকা রাখছেন। নিশ্চয় কিছু চিকিৎসক আছেন যাঁরা দায়দায়িত্বহীন, ক্ষমতালোভী, সুবিধাবাদী এবং ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির। তাঁদেরকে এ আলোচনায় রাখছি না। কারণ তার বাইরেও বিরাট চিকিৎসক সমাজ আছেন যাঁরা কম-বেশি দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বহু চিকিৎসক আবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। বিশেষ করে তরুণ চিকিৎসকেরা অনেকেই সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু সেই চিকিৎসকদের যথাযথভাবে কাজ করবার সুযোগ কম। হাসপাতালে যথাযথ চিকিৎসা সামগ্রী যেমন অপ্রতুল, ঠিক তেমনি চিকিৎসকেরা এখন পর্যন্ত সঠিক সুরক্ষা পাচ্ছেন না। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে এখন পর্যন্ত একটা ল্যাজে-গোবরে অবস্থা চলছে। নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনায় প্রতিদিন আতঙ্কের নানা কারণ বাড়ছে। বাংলাদেশের পাশের দেশ ভারত, যেখানে মোট জনসংখ্যা এক শত সাঁইত্রিশ কোটি সেখানে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচশোর কিছু বেশি। বাংলাদেশে জনসংখ্যা যেখানে ষোল কোটি মানে ভারতের আটভাগের এক ভাগ, সেখানে বাংলাদেশে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজারের বেশি। কেন এমনটা ঘটল? চিকিৎসকদের সুরক্ষার প্রতি ন্যূনতম দৃষ্টি দেননি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বরং ঘরে বসে নিজেদের সুরক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। পত্রিকা সম্পাদক মাহফুজ আনাম তাঁর এক লেখাতে অনেক আগেই বলেন, করোনা ভাইরাসের চেয়ে বড় বিপদ আমাদের মহারথীদের অযোগ্যতা যা বহুদিন ধরে বিপজ্জনক হয়ে আছে। তিনি দেখিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাস সম্পর্কে চমৎকার দিকনির্দেশনা দিলেও, এই অযোগ্য মানুষদের জন্য তা কিছুতেই আগাচ্ছে না। বিভিন্ন কর্তাব্যক্তির, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গাফিলতি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়দায়িত্বহীনতায় বহু অঘটন ঘটে যাবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে বসে আছে। সত্যিকার অর্থে এসবের জন্য কে দায়ী তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। সেরকম অনুসন্ধানের সুযোগ এই মুহূর্তে কম। কিন্তু যিনি যে আসনে বসে রয়েছেন, কর্তব্য অবহেলার দায় তাঁকে নিতেই হবে। যদি দায় শুধু এর-ওর ঘাড়ে চাপানো হয় তাহলে কাজই এগোবে না। যিনি দায় নেবেন না, তিনি কর্তাব্যক্তি সেজে চেয়ারে বসে থাকবেন কেন, দায়িত্বশীল পদ ছেড়ে দেবেন।

যা আজকের নানা সঙ্কট তা ঘটেছে পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা না-নেয়ার কারণে। একই সঙ্গে তা ঘটছে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকতা আর দায়িত্বহীনতার কারণে। করোনা ভাইরাস ছড়ানোর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে বিরাট অর্থনৈতিক বিপর্যয়। প্রস্তুতি না-থাকার কারণে বহু ধরনের অঘটন ঘটেছে ছুটির একবারে শুরুর দিকে। মানুষ প্রতিদিন টন কে টন দুধ ফেলে দিয়েছে। দুধ কেনার গ্রাহক নেই, মিষ্টির দোকান সব বন্ধ। রাজধানীতে যে দুধ পাঠানো হত সেটা আর পাঠানোর সুযোগ ছিল না। প্রচুর খাবার কেনার লোক নেই, মাছ-মাংসে পচন ধরেছিল, তা ফেলে দিতে হয়েছে। যদিও পরে এ সমস্যার অনেকটা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রথম থেকে যদি একটা পরিকল্পনা থাকত, তাহলে এরকম ঘটত না। বাংলাদেশে যেখানে খাবারের অভাব, মানুষের পুষ্টির অভাব; সেখানে আগে থেকে প্রস্তুতি নেয়া থাকলে এসব খাবারের সরবরাহ চালু রাখা যেত ভিন্নভাবে। পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে বিভিন্ন খাবারের অনেকটা স্থানীয়ভাবে দরিদ্র মানুষকে দেয়া যেত। খাবার নেই কিন্তু টন কে টন খাবার ফেলে দিতে হয়েছিল। যারা এসব খাবারের ক্ষুদ্র উৎপাদক তারা কপর্দকহীন হয়ে পড়তে পারত। পূর্বে প্রস্তুতি থাকলে এমনটা ঘটত না। কী কী বন্ধ করতে হবে, আর কী কী বন্ধ করলে বিপদ হবে আগে থেকে জানা থাকলে এমনটা হত না। সরকার এসব ক্ষেত্রে পরে যথেষ্ট ভালো ভূমিকা নিতে পেরেছে। খাদ্য-সরবরাহ সচল রেখে খাদ্যসংকট তৈরি হতে দেয়নি। সরকারকে তার জন্য ধন্যবাদ দিতে হয়। যাদের ক্রয়ক্ষমতা ছিল তারা হাতের কাছে কিনবার মতো খাদ্য পেয়েছে। খাদ্য-সরবরাহ বা যোগানের ব্যাপারে সরকারে উদ্যোগ যথেষ্ট সফল ছিল। সরকার এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক সংকট অনেকটাই আপাতত কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

সরকারের ব্যর্থতা সবচেয়ে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে। বহু ব্যাপারে সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্বিমুখী বা পরস্পর-বিপরীত নীতি গ্রহণ করতে দেখা গেছে। বহু ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। ফলে একটি মন্ত্রণালয় এক ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত দিচ্ছে ভিন্ন মন্ত্রণালয় ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্ত দিচ্ছে। সর্বশেষ উদাহরণটাই দেয়া যাক। সরকার অফিস-আদালত খুলে দিয়েছে আবার অন্যদিকে বলা হয়েছে গণ-পরিবহন চলবে না। পরে আবার বলা হয়েছে, গণ-পরিবহন চলবে। এরকম পরস্পরবিরোধী বহু সিদ্ধান্ত সরকার বার বার নিয়েছে। যা জনগণকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করেছে এবং তারা ভয়াবহ হয়রানির শিকার হয়েছে। করোনা-র এই দুঃসময়ে সঠিকভাবে বিবেচনা করে পরিকল্পনা নিলেও বহুকিছু যেমন এড়ানো যেত না ঠিক, বহু সঙ্কটই আবার এড়ানো যেত। করোনা ভাইরাসের ব্যাপারটা ভূমিকম্পের মতো ছিল না যে, প্রস্তুতি নেয়া বা সঙ্কটকে মোকাবেলা করার সুযোগ ছিল না। যদি পূর্বপ্রস্তুতি থাকত বহুকিছুই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যেত। পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে জনগণকে সচেতন করা যেত। ডা. ইকবাল আরসালান বলেছেন, যা আমরা শুরু করেছি সেটা অনেক দেরিতে শুরু করেছি। যদি ঠিক সময়ে শুরু করা যেত, তা হলে বহুকিছুর সমাধান সম্ভব ছিল। তিনি মনে করেন, সমন্বয়হীনতা ছিল আর-একটি সঙ্কট। প্রথম থেকে বলা হয়েছিল, সব ঠিক আছে, সবকিছু হয়ে যাবে। তিনি মনে করেন, এইরকম কথা বলে মানুষকে সচেতন করা সম্ভব ছিল না। তিনি যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন। তিনি পরেও বার বার বলেছেন, বহু দেরিতে সব কিছু আরম্ভ করা হয়েছে এবং করোনা-র বর্তমান ভয়াবহতার মধ্যেও দায়িত্বশীলরা জাতীয় কমিটির দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী কাজগুলো ঠিকমতো করছেন না। কার্যত মনে হচ্ছে, সঙ্কট সমাধানে এখনো তারা আন্তরিক নন। বরং কর্তব্যক্তিরা এখনো নিজেদের আর্থিক সুবিধা নিতেই ব্যস্ত।

স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি এবং করোনা বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য অধ্যাপক চিকিৎসক ইকবাল আর্সলান গত মে মাসের মাঝামাঝি পুনরায় বলেছেন, ''ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। করোনা মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেওয়ার অনেক সময় পেয়েও আমরা কাজে লাগাইনি। চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেইনি।'' তিনি বলেন, আসলে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই আমরা যুদ্ধে নেমেছি। যাদের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা তারা গণমাধ্যমে বার বার বলেছেন, ''করোনা-র বিরুদ্ধে লড়তে শতভাগ প্রস্তুতি আছে। যুদ্ধে নামার পর দেখা দেখা গেল কোনো প্রস্তুতি নেই। ঢাল-তলোয়ার কিছু নেই।'' তিনি করোনা সংক্রান্ত বাংলাদেশের ভয়াবহ অবস্থার কথা বলতে গিয়ে সংশ্লিষ্টদের সমালোচনা করে বলেন, ''কোভিড সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা না-থাকা, বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত না-নেওয়া ও সময় পেয়েও প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে নামায় আজ এই বিপর্যয়। পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে।'' সরকারের যদি করোনা মোকাবেলায় এবং জনগণের জীবনপ্রাণ রক্ষায় সঠিক পরিকল্পনা এবং আন্তরিকতা থাকত তা হলে খুব সুচিন্তিত কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেত। সবকিছু নিরীক্ষণ করার পর কিছু কিছু বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র অঞ্চলকে আগে থেকেই মুক্ত এলাকা ঘোষণা করা দরকার ছিল। করোনা দ্বারা সংক্রমিত নয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত না-হয়ে সেখানে কেউই প্রবেশাধিকার করতে পারবে না। তাহলে সেইসব ব্যাপক অঞ্চলে চাষাবাদ আর সবকিছু স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হত। কিন্তু এসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সামান্য পরামর্শ নেয়া হচ্ছে না। সকল সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন আমলারা।

গত ১৫ জুন ডা. ইকবাল আর্সলান বলেন, ''জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক এবং এ নিয়ে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির পরামর্শ না-নিয়ে শুধুমাত্র আমলারা তাদের নিজ দায়িত্বে এবং নিজ কর্তৃত্বে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'' তিনি আরো বলেন যে, আমলারা এখন সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। তারা একাধারে জনস্বাস্থ্য ও করোনা বিশেষজ্ঞ এবং প-িত। তারাই সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এখন বিশেষজ্ঞ বা জনস্বাস্থ্য কর্মীদের কোনো গুরুত্ব নেই। করোনা চলাকালে সম্প্রতি যে জাতীয় বাজেট

ঘোষিত হয়েছে তা প্রমাণ করে রাষ্ট্রটি ধনীদের সুবিধা দেয়ার জন্য যত উদগ্রীব, জনগণের চিকিৎসা প্রদানে তার সামান্যমাত্র নয়। করোনা আক্রমণকে কাজে লাগিয়ে যেন ধনীরা তাদের মুনাফা লাভের সিঁড়িটাকে আরো উঁচু করে তুলতে চাইছে। রাষ্ট্র এখনো জনগণের অভিযোগ নিয়ে ভাবছে না। করোনা সংক্রমণে বিশেষজ্ঞদের দেয়া পরামর্শ পর্যন্ত কানে নিচ্ছে না।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ মহামারির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে, বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক তালিকার শীর্ষ আঠারো নম্বরে রয়েছে। বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে সংক্রমণের হার বিভিন্ন বিপর্যস্ত দেশের চেয়ে বেশি। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর দায়দায়িত্বহীনতা আর বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তার অভাব থেকে সেটা বেশি ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা দরকার, বর্তমানে সরকারের ঘোষিত করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যার চেয়ে প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি। গত মে মাসের মাঝামাঝি আইইডিসিআর-এর একজন উপদেষ্টা ডা. মুশতাক বলেছেন, ''করোনা রোগীর সংখ্যা আসলে শনাক্তের চেয়ে বিশ থেকে চল্লিশ গুণ বেশি হতে পারে''। গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. বিজন কুমার শীল কিছুদিন আগে বলেছেন বাংলাদেশের ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আবার সুস্থ হয়ে গেছেন কিন্তু বহু জনই তা টের পাননি। বিএমএ-র মহাসচিব সম্প্রতি একই কথা বলেছেন। তিনি, এ প্রসঙ্গে বলেন, এখনো স্বাস্থ্য বিভাগের প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে বাস্তবতার অনেক গরমিল রয়েছে। যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম হয়েছে, তখন বাস্তবের সঙ্গে সরকারের তথ্যের গরমিল থাকবেই। ডা. মুশতাক এবং ডা. বিজন কুমার করোনায় আক্রান্তের যে সংখ্যাটা বলেছেন গবেষণা করে কথাটা বলেননি, ফলে তাদের সংখ্যাটা নিয়ে গুরুত্ব না-দিয়ে কথার ভাবটাকে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। সরকার সংখ্যাটা ঘোষণা করেছে তার করোনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে। কিন্তু দেশের বেশির ভাগ মানুষের যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি তখন মূল সংখ্যাটা যে সরকারের ঘোষিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হবে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার কারণ নেই। কারণ বেশির ভাগ মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা গেলে যে সংখ্যাটা বহু গুণ ছাড়িয়ে যেত সেটা বিশ্বাস করার যুক্তি আছে বর্তমানে সীমিত আকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিসংখ্যান দেখে। সরকার আদৌ এসব ব্যাপারে স্বচ্ছ নয়।

প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক আবদুল্লাহ গত মে মাসের শেষে বলেছেন, ''সারাদেশেই করোনা এখন আমাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন ঢাকার বাইরে করোনা-র প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি অত্যন্ত আতঙ্কের এবং এর ফলে মহাবিপদ সৃষ্টি হতে পারে।'' তিনি এ কথাও বলেন, ''নাগরিক হিসেবে আমাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে সমন্বয় করে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। নাহলে আমরা এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হব।'' তিনি যথার্থ বলেছেন। অধ্যাপক আবদুল্লাহ বলেন, ''ঢাকার বাইরে চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক দুর্বল। গুরুতর অসুস্থ রোগীদের ঢাকার বাইরে করোনা চিকিৎসা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ সেখানে অক্সিজেনের স্বল্পতা রয়েছে। আইসিইউ নেই। এমনকি উপজেলা পর্যায়েও আমাদের জটিল করোনা রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার হবে।'' তিনি বলেন, ''ইতিমধ্যে সরকারি হাসপাতালগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। যে বেসরকারি হাসপাতাল সরকার নিয়েছিল, সেখানেও এখন জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। যদি রোগী এভাবে বাড়তে থাকে তাহলে হাসপাতালে জায়গা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে, যা আমাদের জন্য আরেকটি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'' চিকিৎসক আবদুল্লাহ বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার একটি করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। চিকিৎসক আবদুল্লাহ যা বলেছেন যা প্রকট উদাহরণ হল, চিকিৎসকেরাই আর নিজ হাসপাতালে চিকিৎসা পাচ্ছেন না। কিন্তু গত তিন মাসে সরকার চাইলে করোনা-র চিকিৎসার জন্য অস্থায়ী হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ানো যেত।

করোনা-র আক্রমণের এই ভয়াবহতার মধ্যে যদি এখন সামনের সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে বাঁচতে চাই, তাহলে কৃষির দিকে নজর দিতে হবে। না হলে মহামারির পাশাপাশি দেখা দেবে খাদ্যসংকট বা দুর্ভিক্ষ। কৃষি বা চাষাবাদের ব্যাপারটাতে তাই এখন বিশেষ জোর দিতে হবে। গ্রামের লোকসংখ্যা কম, সেখানে দূরত্ব বাঁচিয়ে কাজ করা সম্ভব। বিভিন্ন ধরনের প্রচার দ্বারা গ্রামের মানুষদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে করোনা-র সংক্রমণ থেকে তারা নিজেদের মুক্ত রাখতে পারে। ফলে কৃষিকর্মে যুক্ত মানুষদের নানাভাবে সহযোগিতা দিয়ে যেতে হবে। চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা করোনা ভাইরাসের আক্রমণের শিকার হলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে। ফলে গ্রামগুলোকে যতটা সম্ভব এই আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। করোনা-র আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনার পর যদি সকল রকম বিপর্যয় থেকে প্রাথমিকভাবে বাঁচতে চাই, কৃষিই আমাদের বাঁচাবে। মনে রাখতে হবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর যখন কিছু ছিল না, প্রথমে সুরক্ষা দিয়েছিল কৃষি-অর্থনীতি। যুদ্ধের সময় কৃষিকাজ বন্ধ ছিল না। সারা পৃথিবীর অর্থনীতির মূল হচ্ছে কৃষি বা খাদ্য। মানবসভ্যতার প্রথম অর্থনীতি কৃষি বা চাষাবাদ। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করার পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে যা করতে হবে, চাষাবাদ চালু রাখা আর খাদ্যসংকট থেকে রক্ষা পাওয়া। চাষাবাদের ব্যাপারে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলা এবং তাদের পরামর্শ নেয়া খুব দরকার।

হাঁস-মুরগি গবাদিপশু পালন বা চাষ যেন বন্ধ না-হয়ে যায় তার জন্য সকল অপ্রয়োজনীয় খাত বাদ দিয়ে সেখানে টাকা ঢালতে হবে। সকলকে উৎসাহ জোগাতে হবে নিজের বাড়ির সঙ্গে চাষযোগ্য জমিতে কিছু একটা চাষ করার জন্য। কৃষির বাইরেও কিছু

কিছু প্রয়োজনীয় উৎপাদন চালু রাখতে হবে। বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে মনোযোগ দিতে হবে। যারা এই উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, তাদেরকে সচেতন করতে হবে নিজেদের সুরক্ষা সম্পর্কে। যতটা সম্ভব বয়স্কদের বাদ দিয়ে কমবয়স্কদের এসব কর্মে যুক্ত রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ সচল রাখতে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের কথা আলাদাভাবে ভাবতে হবে। পুলিশ সহ সবকিছু সচল রাখতে যাঁরা যুক্ত সকলে যেন সংক্রমণের শিকার না-হন, যেন সুরক্ষা পান সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। কিছু মানুষজন যতদিন গৃহবন্দি থাকছে ততদিন কর্মে নিযুক্ত অন্যদের সুরক্ষা লাভের সুযোগ তুলনামূলকভাবে বাড়ছে। মানুষকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এসময়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে যেতে হবে। গণমাধ্যমগুলোর কাজ হবে নিয়মিত সাধারণ মানুষকে বোধগম্য ভাষায় করোনা ভাইরাস সম্পর্কে বলা, সুরক্ষিত থাকার পথ দেখানো। সাধারণ মানুষেরা বিজ্ঞানের কথা সহজভাবে বললে গ্রহণ করবে না, হতেই পারে না। কারণ তাদের জীবনসংগ্রাম বিজ্ঞানসম্মতভাবেই পরিচালিত হয়ে থাকে। না হলে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তারা ফসল ফলাতে পারতেন না। ঋতুর নিয়ম মেনে তারা চাষ-আবাদ করেন, পুরোহিতের কথা শুনে নয়। বিজ্ঞানের কথা সকলের আগে তারা গ্রহণ করবে যদি তাদেরকে সঠিকভাবে বোঝানো যায়।

করোনা রোগীদের চিকিৎসা নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন যে খবরগুলো আসছে তা মেনে নেয়া কষ্টকর। বিভিন্ন হাসপাতালে ভিআইপি রোগীরা বিশেষ সুবিধাগুলো পাচ্ছেন সরকারের হস্তক্ষেপে। সাধারণ বহু রোগী সেসব সুবিধা পাচ্ছেন না। বিনা চিকিৎসায় তাঁদের মৃত্যুর দিন গুণতে হচ্ছে। চট্টগ্রাম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হিরন্ময় দত্ত লিখেছেন, হাসপাতালের যে জায়গাটা বিশেষভাবে পঁচিশ জন রোগীর জন্য নির্ধারিত সেখানে আঠারো-বিশটা শয্যায় অক্সিজেন পোর্ট আছে আর একটা পোর্ট একজন রোগীর চাহিদা যোগান দিতে পারে। কিন্তু সেখানে শয্যা আর মেঝে মিলিয়ে পঁচিশ জনের জায়গায় রোগী আছে নব্বই জনের বেশি যাদের প্রায় সকলের অক্সিজেন দরকার। ফলে দেখা যাচ্ছে একটা পোর্ট থেকে ভাগাভাগি করে চার-পাঁচ জন অক্সিজেন নিচ্ছেন। করোনা রোগীরা নিজেদের মধ্যে সামান্য গ্যাপ না-রেখে হাসপাতালে অবস্থান করছেন। চিকিৎসক যে রোগী দেখার জন্য হাঁটবেন সে জায়গাটা পর্যন্ত নেই। সেখানে আবার আছেন রোগীর দেখাশুনা করার আত্মীয়স্বজনরা। কিছু তরুণ চিকিৎসক তাঁর মধ্যে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চিকিৎসা দিয়ে চলেছেন দেবদূতের মতো। ডা. হিরন্ময় দত্তের কথাগুলো বুঝিয়ে দেয় তরুণ চিকিৎসকেরা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও জানিয়ে দেয় সামনের দিনগুলো আরো কতটা ভয়ঙ্কর। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেছে, ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সঠিকভাবে চিকিৎসা না-পেয়ে মারা গেছেন। অধ্যাপক কিবরিয়া অসুস্থ অবস্থায় নিজের জন্য অক্সিজেন চেয়ে পাননি, বলা যায় চিকিৎসা-সুবিধা লাভ না করেই মারা যান। বহু উদাহরণ বাড়ানো যাবে। প্রতিদিন খবর আসছে, রোগীদের নিয়ে আত্মীয়স্বজনেরা হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে কিন্তু ভর্তি করাতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত রোগী তাদের চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় ছটফট করতে করতে মারা যাচ্ছে। কীরকম একটা রাষ্ট্র আমরা পেয়েছি তা এখন বুঝতে আর অসুবিধা হয় না।

করোনা রোগীরা চিকিৎসা পায় না, রোগীদের অক্সিজেন জোটে না– মহামারির ক্ষেত্রে অনেক সময় এমনটা মেনে নেয়া যায়। ঘটনা এমনটা হতেই পারে যখন হঠাৎ মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যে দেশে সরকারি আমলা মন্ত্রীরা কোটি টাকা দামের গাড়ি চড়েন সে দেশে এসব মানা যায় না। কারণ কোটি টাকা দিয়ে হাসপাতালের জন্য বহু অক্সিজেন সামগ্রী কেনা সম্ভব। বাংলাদেশে ব্যবসায়ীদের কথা বাদ দিলে, সরকারি লোকজনেরা যেভাবে বিলাসিতা করার সুযোগ পান, সেটা আর এখনকার চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে সামান্য মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে যেখানে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় খুবই কম, সেখানে সরকারি আমলা-মন্ত্রী-সাংসদদের বিলাসিতা করা, দামি গাড়ি চড়ে বেড়ানোটা আর যুক্তিসঙ্গত হয় না। রাষ্ট্র আসলে এইসব সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে আদৌ ভাবে কিনা সেটাই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। করোনা ভাইরাসের আক্রমণ বহুকিছুকে স্পষ্ট করে তুলছে, বাংলাদেশে আসলে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার চেহারাটা কী দেখা যাচ্ছে। সারা দেশে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে ন্যূনতম পঁচিশ জন চিকিৎসক মারা গেছেন। খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, তাঁরা অনেকেই সঠিক চিকিৎসাটা পাননি। স্বাস্থ্যখাতের নানারকম অনিয়ম আর দুর্নীতির খবর আসছে প্রতিদিন। সেই দুর্নীতি এতটাই ভয়াবহ যে, ডা. আবদুল্লাহ সম্প্রতি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন যে, দুর্নীতি বন্ধ না-করে স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বাড়িয়ে লাভ নেই। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু সে টাকাটাও চলে যায় জনগণের চিকিৎসায় ব্যয় না হয়ে চলে যায় দুর্নীতিবাজদের পকেটে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এসব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। বাজেটে ব্যয় বাড়ালে তা দুর্নীতিবাজদের পকেটে চলে যাবার সম্ভাবনা। সে রকম একটি দেশের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেয়াটাই তো লক্ষ্যহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে তাই মন্ত্রণলয়ের ওপর নিশ্চিত ভরসা করে বসে না-থেকে সকল স্তরের বিশেষজ্ঞ এবং সৎ পেশাজীবীদের যুক্ত করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের ওপর থাকবে তাদের সকলের নজরদারি। প্রতিদিনের টাকা খরচের হিসাবটা চলে যাবে অনলাইনে, যাতে পুরো দেশবাসী চাইলে তা নজরদারি করতে পারে। বাড়তি টাকাও দিতে হবে এর জন্য। তার পর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজে এগোতে হবে এবং খুব দ্রুত। চিকিৎসক আবদুল্লাহ যে কথাগুলো বলেছেন, তার প্রেক্ষিতে বলা যায় যখন রোগীর সংখ্যা প্রতিদিন বিপুলভাবে বাড়ছে তখন বিভিন্ন মধ্যম মানের বড়সড় হোটেল আর বিশেষ কিছু প্রতিষ্ঠানকে

হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। হাসপাতালগুলোতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ দরকার নেই। দরকার খুব সাধারণ হাসপাতাল যেখানে সূর্যের আলো ঢুকবে এবং বাতাস চলাচল করবে। সেখানে চিকিৎসার সামগ্রী ঠিকঠাক থাকতে হবে। দরকার হলে দ্রুত সকল প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য সমন্বিতভাবে বসে দাম এবং মান যাচাই করে নির্দেশ পাঠাতে হবে বিভিন্ন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে। হাসপাতালের ভবনগুলো কতটা আধুনিক তা এখন আর জরুরি নয়। দরকার পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, শৌচাগার, পয়ঃনিষ্কাশনের সকল সুবিধা থাকা। কিছু কিছু সুবিধাজনক হোটেলকে এই মুহূর্তে হাসপাতালে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। খুব বিলাসবহুল কক্ষ তার জন্য দরকার নেই, দরকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। কিউবার হাসপাতালগুলো খুব বিলাসবহুল নয়, সাধারণ মানের। কিন্তু সেখানে প্রতি একশো ত্রিশজনের জন্য একজন চিকিৎসক রয়েছেন। বিলাসিতা দেখানোটা সেখানে প্রধান নয়, প্রধান লক্ষ্যটা হল জনগণকে চিকিৎসা প্রদান। লক্ষ্য বাদ দিয়ে উপ-লক্ষ্য নিয়ে হৈ-চৈ করার কিছু নেই। প্রধান বিষয় ভবনটা কত সুন্দর তা নয়, চিকিৎসকরা রোগীর প্রতি কতটা দায়িত্বশীল আর চিকিৎসকরা কতটা মেধাবী আর দক্ষ। যদি সামনের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে কিছুটা স্বস্তি লাভ করতে হয় সরকারকে অস্থায়ীভাবে করোনা সংক্রান্ত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কিছু উদ্যোগ দ্রুততার সঙ্গে নিতে হবে। দ্রুততার সঙ্গে কিছু চিকিৎসক আর চিকিৎসাসেবীকে করোনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সেখানে নিয়োগ দিতে হবে।

সংকট এড়াবার পথ যখন নেই, খুব ঠা-া মাথায় বিবেচকের মতো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সকল বিপদে উদ্ধারের একটা-না-একটা পথ থাকবেই। পথটা খুঁজতে হবে, সেজন্য সবচেয়ে বেশি দরকার সকল পেশার মানুষের সমন্বিতভাবে এবং পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাওয়া। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, যার বিরুদ্ধে লড়াই সে আমাদের কোনো সচেতন শত্রু নয়। নিজে কিছু না-বুঝেই আমাদের আক্রমণ করে বসছে। কথাটা তো ঠিক আমাদের নিজেদের অসতর্কতার জন্য সে বিরাট হয়ে উঠেছে। যদি পাশ্চাত্য আগে সচেতন হত, তা হলে ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এইরকম দেশগুলো বিপদে পড়ত না। যদি তারা বিপজ্জনক পরিস্থিতির শিকার না-হত আমরা অনেক বেশি নিরাপদ থাকতে পারতাম। কিন্তু যা ঘটে গেছে তা ফেরানো যাবে না। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকেই কাজ আরম্ভ করতে হবে। প্রধান কাজটাই হচ্ছে, রাষ্ট্রের সকল সামর্থ্য, সকল সম্পদ এই লড়াইয়ে নিয়োজিত করা। সকল মানুষকে বিষয়টা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। গণমাধ্যমগুলো এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো ভূমিকা রাখতে পারবে এসময়ে। গণমাধ্যম এ সময়ে মানুষকে সাহস জোগাতে বিরাট শক্তি। সরকারকে সারা দেশজুড়ে এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার চালাতে হবে সংক্রমিতদের সঠিক সংখ্যা জানার জন্য। বাংলাদেশে ন্যূনতম প্রতিদিন এক লক্ষ লোকের পরীক্ষা হওয়া দরকার। সম্ভব হলে আরো বেশি। সরকারের সকল সম্পদ এখন করোনা প্রতিরোধে ব্যয় করতে হবে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ব্যর্থতা

বলতে আর দ্বিধা নেই, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভূমিকা অকার্যকর। প্রথম থেকেই, প্রতিষ্ঠানটি "ধরি মাছ না-ছুঁই পানি" এরকম একটা জায়গায় অবস্থান করছে। নিজের সুবিধা বা স্বার্থে সেটা করে করুক। কিন্তু হু করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবার জায়গা থেকে মানুষের সামনে সে কোনো যথাযথ পরিকল্পনা বা দিকনির্দেশনা রাখতে পারেনি। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে তার অবস্থান কখনোই মানুষের মনে আশা জাগায়নি, ঠিক তেমনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোনো সামগ্রিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেনি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভাঙা রেকর্ড বাজানোর মতো করে বার বার যা বলছে, তা হল লকডাউন, কোয়ারেন্টাইন আর সাবান-পানি দিয়ে বিশ সেকেন্ড হাত ধোয়া বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, হাঁচি হলে রুমাল দিয়ে বা হাতের কনুই দিয়ে নাক ঢাকা। বিশ সেকেন্ডই সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে কেন, কেন বিশ সেকেন্ডের কম নয়, বিশ সেকেন্ড হাত ধুলে কী হবে; সাধারণ মানুষের কাছে সেটাও তারা স্পষ্ট করতে পারেনি। স্পষ্ট করার চেষ্টাও করেনি। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের সঙ্গে বিশ সেকেন্ড হাত ধোয়ার সম্পর্কটা কোথায়, কেন বিশ সেকেন্ড সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়াটা জরুরি বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষ তা জানে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটা জানানোর জন্য তেমন কোনো পদক্ষেপই নেয়নি। নিরক্ষর দরিদ্র মানুষের কথা বাদ দিলাম, বিশ সেকেন্ডের অধিক সময় সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুলে করোনা ভাইরাস কীভাবে অকার্যকর হয়, সেটা যথেষ্ট সনদধারী শিক্ষিত বহু মানুষ পর্যন্ত জানেন না। সমাজের অগ্রগণ্য বহু জনের সঙ্গে কথা বলে এ ধারণা আমার হয়েছে। না-জানাটা তাদের দোষ নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেমন ব্যাপারটা পরিষ্কার করেনি সাধারণের কাছে, স্থানীয় গণমাধ্যম বা চিকিৎসরা পর্যন্ত সেটা স্পষ্ট করে বলছেন না।

নিশ্চয় বিশ সেকেন্ড সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়া খুবই কার্যকর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ জানে না সেটা কেন বা কীভাবে কার্যকর। ফলে যারা অন্ধ অনুকরণে হাত ধুচ্ছে, আমি আমার চারদিকের মানুষের ক্ষেত্রে দেখেছি খুব ভুলভাবে সেটা পালিত হচ্ছে। বাজার থেকে ফিরে কেন হাত ধোবে, কেন গোসল করবে বা কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলবে সেটাও তাদের কাছে পরিষ্কার নয়। ফলে সব কিছু তারা করছে কিন্তু কোনোটাই সঠিকভাবে নয়। ধর্ম পালন করার মতো অন্ধভাবে নির্দেশ পালন করে চলেছে। কিন্তু দরকার ছিল চিত্রের সাহায্যে বার বার সবাইকে দেখানো যে, সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুলে করোনা ভাইরাসটি কী সঙ্কটে পতিত হয়। সাবান-পানি আর করোনা ভাইরাসের সম্পর্ক কী আর কীভাবে সেটা করোনা

ভাইরাসকে অকার্যকর বা ধ্বংস করে দেয়। সত্যিকারভাবে করোনা ভাইরাসের পরিচয়টি তুলে ধরে কীভাবে সাবান-পানি তার ধ্বংস ঘটায় যদি জনগণকে বোঝানো যেতো, তা হলে সংক্রমণ কিছুতেই এতটা ছড়াত না। মাস্ক ব্যবহার আর দূরত্ব বজায়-এর মাধ্যমে করোনা-র সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা আর সাবান-পানির সাহায্যে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জীবাণু ধ্বংসের প্রক্রিয়াটি যদি সকল মানুষকে সহজভাবে উপলব্ধি করানো যেত, করোনা-র আক্রমণ বিশ্বজুড়ে এভাবে বিস্তার লাভ করত না। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সরকার আর হাসপাতালগুলোকে এটাও বোঝানো দরকার ছিল, করোনা-র একমাত্র প্রধান চিকিৎসা হচ্ছে দরকারমতো সংক্রমিতদের অক্সিজেন সরবরাহ। করোনা আক্রান্ত রোগীরা অন্যরা সকলে সাধারণ চিকিৎসায় ভালো হয়ে যাবে, যাদের ফুসফুস আক্রান্ত হবে তাদের জন্য দরকার পড়বে অক্সিজেন, অক্সিজেন আর অক্সিজেন। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে টিকা নেই, পরীক্ষিত কোনো ওষুধ নেই; সেটা ঠিক আছে। কিন্তু ভয়াবহভাবে আক্রান্তের জন্য মূল চিকিৎসা যে অক্সিজেন সেটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা বড় বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কেউই বুঝাতে চেষ্টা করেনি। বিরাট একটা সঙ্কট তৈরি হয়েছে এই সত্যটা জোরালোভাবে লাগাতার প্রচার না-করাটা। করোনায় আক্রান্ত বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ যথাসময়ে বা যথাযথ অক্সিজেন না-পাওয়াটা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সমাজের ক্ষমতাবানদের জায়গা। সেখানে যারা কাজ করেন তারা নিজেদেরকে ভাবেন সমাজের অগ্রণী, মনে করেন তাদের মতো মহান ক্ষমতাধর জ্ঞানী মানুষদের নির্দেশে বিশ্ব চললে জনগণের উপকার হবে। ফলে নির্দেশ দিয়েই তারা খালাস, তারা মনে করেন সঠিক নির্দেশ দিয়ে বিশ্বের বিরাট উপকার করে ফেলেছেন। কিন্তু সবটা না-বুঝে সে নির্দেশ মানুষ কেন অন্ধের মতো পালন করবে, সে বিবেচনায় তারা যান না। তাদের শিক্ষার অহঙ্কার বা তাদের প্রাপ্ত শিক্ষা তাদেরকে এটাই শিখিয়েছে, তাদের অনুসরণ করলেই দেশ ও জাতির মঙ্গল। যদি উদ্দেশ্য সৎ বা মহৎ হয় তবুও অন্ধ অনুকরণে সঠিক ফল পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনেকগুলো সঠিক পরামর্শ দিতেই পারেনি। তার মধ্যে হাসপাতালে যেন কিছুতেই অক্সিজেনের ঘাটতি না-দেখা দেয় তার জন্য সতর্ক রাখা, দরকার হলে অস্থায়ীভাবে হাসপাতাল বাড়ানো যাতে সংক্রমণের সংখ্যা বেড়ে গেলে রোগীদের চিকিৎসা পেতে অসুবিধা না-হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এ ব্যাপারে নির্দেশনা নেই। যদি খুব প্রয়োজনীয় এটুকু নির্দেশনা দিতে না-পারে তাহলে সে কীসের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথমে বলেছে, যারা করোনা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত নয়, তাদের মাস্ক পরার দরকার নেই। সেই কথা শুনে অন্ধভাবে বাংলাদেশের আইইডিসিআর বলে দিল যারা করোনা রোগী নয় তাদের মাস্ক পরার দরকার নেই। সাধারণের মাস্ক পরা নিয়ে ব্যঙ্গ করতে পর্যন্ত ছাড়ল না সেখানকার কর্মকর্তারা। কিন্তু এখন কী দেখা গেল, সকলকে মাস্ক পরতে হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বড় দায়িত্বটি ছিল করোনা ভাইরাস সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা। কিন্তু তা তারা করেনি, তারা কিছুটা সতর্ক করেছে মাত্র। সতর্ক করেছে এমনভাবে যে ভদ্রলোকদের কাছে সেটা মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের ভদ্রলোকেরা এখন লক-ডাউন আর কোয়ারেন্টাইন ছাড়া আর কিছু বুঝতে রাজি নয়।

সত্যি বলতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করেন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই নিজেদের ভোগবিলাস আর সুযোগসুবিধা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। ফলে জনগণের সেবায় এসব প্রতিষ্ঠান খুব কার্যকর হয় না; কিছু গৎ-বাঁধা গবেষণা, কিছু গৎ-বাঁধা কার্যক্রম পালন করে চলে। তাতেই তারা তৃপ্ত থাকে। বেতন নেবার জন্য কাজ করে, মানুষের মঙ্গলের জন্য নয়। আমার এক বন্ধু কিছুদিনের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় গবেষণা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদিন কাজ করেননি। তাঁর বন্ধুটি তখন হু'র বড় পদ দখল করে আছেন। কিন্তু দিল্লিতে যখন কাজ করতে গেলেন, দিল্লির হু'র কর্তাব্যক্তিটি আমার বন্ধুটি সম্পর্কে জানতেন যে, তিনি সবসময় নিজের অর্থে জনগণের স্বার্থে বহু গবেষণা করে সুনাম আর সম্মান অর্জন করেছেন। দিল্লির কর্তাটি তাই শুরুতেই আমার বন্ধুকে বলে দিয়েছিলেন, তিনি যেন গবেষণা প্রস্তাবনার বাইরে গিয়ে বিপ্লবী কিছু করার চেষ্টা না-করেন। আমাদের এ বন্ধু প্রচুর প্রাপ্তিযোগ থাকা সত্ত্বেও সেখানে আর চুক্তি শেষ হবার পর থাকেননি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যদি এই হয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সে কি মানুষের কল্যাণে কিছু করতে পারবে? বরং তার দ্বারা বিশ্বের স্বাস্থ্যসেবা বিভ্রান্ত হবে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে এই সংস্থাটি এক-এক সময়ে এক-এক রকম অদ্ভুত সব কথা বলছে আবার তা ফিরিয়ে নিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির আসল কার্যক্রম কী তাতে ধারণা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান একটি দায়িত্ব ছিল করোনা ভাইরাসটির সঙ্গে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেয়া, তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তারিতভাবে মানুষকে জানিয়ে দেয়া। ভাইরাসটি নিজে নিজে কোন পরিবেশে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে, মানুষের শরীরের বাইরের ত্বকে তা কতটা সময় বেঁচে থাকে, মানুষের পোশাকে এবং ঘরের আসবাবপত্রে কতটা সময় টিকে থাকে ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে মানুষকে একটি প্রাথমিক ধারণা দেয়া হু'র দায়িত্ব ছিল; যাতে মানুষ সেই হিসেব থেকে কার্যকরভাবে ভাইরাসটির সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু হু এসব করেনি। কিছু মানুষ জনস হপকিন্স-এর গবেষণাপত্র, ইংল্যান্ড মেডিক্যাল জর্নাল ইত্যাদি থেকে এ সম্পর্কে কিছুটা জানতে পেরেছে। সেইসব গবেষণায় দেখা যায়, শীত বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বদ্ধ কক্ষ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলার জন্য মোটেই ভালো কিছু নয়। জাপান-সহ কয়েকটি দেশের গবেষণাপত্র বলছে 'বদ্ধ ঘর' খুবই খারাপ, যেখানে আলো-বাতাস চলাচল রয়েছে সেরকম কক্ষ করোনা সংক্রমণ থেকে রক্ষার

জন্য অধিক কার্যকর। সূর্যের আলো বিশেষ করে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি করোনা ভাইরাস ধ্বংসে বেশ উপযুক্ত। যদি আমরা লক্ষ করি দেখব, শীতপ্রধান দেশগুলোতে করোনা আক্রমণের প্রকোপ আর মৃতের হার অনেক বেশি। কারণ প্রচ- শীতে দরজা-জানালা খোলার সুযোগ নেই বলে মানুষকে সেখানে বদ্ধ ঘরে থাকতে হয়। দেখা গেছে যেখানে করোনা ভাইরাস অনেক বেশি সময় অনেক শক্তি নিয়ে টিকে থাকতে পারে। ফলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বদ্ধ ঘরে, যেখানে আলো-বাতাস কম চলাচল করে সেরকম হাসপাতালগুলোতে করোনা ভাইরাস অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। সূর্যের তাপ যেখানে প্রবেশ করে এবং যেখানে আলো-বাতাস প্রবাহিত হয়, সেরকম স্থান ভাইরাসকে যতটা দুর্বল করতে পারে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বদ্ধ ঘর তা পারে না। কিন্তু এসকল ব্যাপারে হু কোনো দিকনির্দেশনা দেয়নি।

বহু জন বলবেন, যদি গ্রীষ্ম বা গরম আবহাওয়া করোনা ভাইরাসকে দুর্বল করতে পারে, তা হলে বাংলাদেশে এত মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে কেন কিংবা ভারতে? চিন্তা করতে হবে এ সঙ্কটের প্রকৃত কারণটি কী। দুর্ভাগ্য যে, হু আমাদের এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতে পারেনি। যদি আমার মস্তিস্ক ব্যবহার করি তা হলে দেখব, গরম বা আলো-বাতাস কখনো আক্রান্ত রোগীর শরীরের ভিতরের ভাইরাসকে দুর্বল করতে পারে না। কারণ মানুষের শরীরের ভিতরে প্রাকৃতিক গরম বা আলো-বাতাস প্রবেশ করে না। ফলে মানুষের শরীরের ভিতরে ভাইরাসে তা কার্যকর নয়। সেটা দুর্বল করে মানুষের শরীরের বাইরের ভাইরাসকে। ফলে রাস্তাঘাটে, বাতাসে, বস্তুর উপর থাকা ভাইরাসকে দুর্বল করে গরম আবহাওয়া, আলট্রাভায়োলেট রে আর আলো-বাতাস। ফলে শীতপ্রধান দেশের রাস্তাঘাটে বা বাইরের বিভিন্ন বস্তুতে বা পণ্যদ্রব্যে ভাইরাসটি যতক্ষণ টিকে থাকবে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ক্ষেত্রে তা ঘটবে না।

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে শীতপ্রধান আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খুব একটা ফারাক হবে না। ভাইরাসটি কীভাবে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে? শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যম। ফলে যখন কেউ একজন আক্রান্ত রোগীর সামনে গিয়ে সরাসরি তার দ্বারা আক্রান্ত হবে, তার কাছ থেকে সরাসরি নিজের নাকের ভিতরে ভাইরাসটিকে গ্রহণ করবে, তখন গরম আবহাওয়া বা আলো-বাতাস আর সাহায্য করতে পারবে না। কারণ আলো-বাতাস বা গরম ভাইরাসটিকে দুর্বল করার আগেই তা সরাসরি একজনের শরীর থেকে আর-এক জনের শরীরে প্রবেশ করবে। কিন্তু ধরা যাক একটি পণ্য, যা বহুক্ষণ সূর্যের তাপের স্পর্শে এসেছে তার উপর থাকা ভাইরাসটি দুর্বল হবে। না-হলে সূর্যের তাপে কিছুক্ষণ রেখে কাপড়-চোপড়, পিপিই, বা মাস্ক জীবাণুমুক্ত করার কথা বলা হচ্ছে কেন?

ফলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বদ্ধ ঘরে রোগীর হাঁচি থেকে বের হয়ে আসা জীবাণু হাসপাতালের বিছানায়, বিছানার চাদর বা খাটে বা মেঝেতে কিংবা চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর পিপিই বা পোশাকে যতক্ষণ টিকে থাকবে, আলো-বাতাস প্রবাহিত হয় এমন ঘরে ততক্ষণ থাকবে না। কী হচ্ছে তা হলে? বদ্ধ ঘরের বিছানার চাদর স্পর্শ করলে যতটা ভাইরাস ছড়াবে আলো-বাতাস আছে এমন ঘরে তার চেয়ে কম ছড়াবে। হু এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা দেয়নি। কিন্তু অন্যান্য অনেক গবেষণার প্রেক্ষিতে এরকম ধারণা করার যুক্তি আছে। যদি সেটা না-হত, ভারত-বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে যেখানে মানুষ কিছু মানছে না, সেখানে রোগীর সংখ্যা আরো অনেকগুণ বেড়ে যেত। ধরা যাক, আমার নিবাস বহুতল ভবনের চারদিকের কিছু মানুষ যেমন দারোয়ান, পিয়ন, নিরাপত্তারক্ষী আর ছোট দোকানদারেরা যেভাবে সর্বক্ষণ মালিকপক্ষের জন্য এটা-ওটা কিনছে, যেভাবে দোকানদারেরা বহু মানুষের কাছে তা বিক্রি করছে; আমি দেখলাম এদের একজনও দু'মাসে আক্রান্ত হয়নি। বহাল তবিয়তে আছে, একজনেরও আক্রান্ত হওয়ার খবর পাইনি। খুব অবাক করার ব্যাপার নয় কি? কারণ তাদের বিক্রি করা বা ক্রয় করা পণ্যের ভাইরাসটি তত শক্তিশালী নয়, আলো-বাতাসে আর গরমে তা দুর্বল হয়ে গেছে। না-হলে প্রতিদিন এতরকম পণ্য স্পর্শ করার পর তারা আক্রান্ত হচ্ছে না কেন? উার বার যে তারা হাত ধুচ্ছে তা-ও কিন্তু নয়। ফলে গ্রীষ্ম বা সূর্যের তাপ আর আলো যে একটা সহযোগিতা করছে, তা মেনে নেবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোনো নির্দেশনা বা গবেষণাপত্র নেই।

ভিন্ন প্রসঙ্গ: বাংলাদেশের মানুষ এখন দু'ভাগে বিভক্ত

বাংলাদেশের মানুষ করোনাকালে স্পষ্ট দুটো শিবিরে বা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। যার একদিকে আছে, লক-ডাউনের পক্ষের মানুষ যাদের খাওয়া-থাকার চিন্তা নাই। মাসের পর মাস তারা ঘরে বসে থেকে নিশ্চিন্তে আহার জোগাতে পারে। স্বচ্ছল এরকম মানুষের বিপরীতে আর এক পক্ষ আছে, যাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম এত তীব্র যে করোনা ভাইরাস নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। লক-ডাউনে ঘরে বসে বসে নিশ্চিন্তে খাবার মুরোদ নেই তাদের। সমাজে তাদের এমন ক্ষমতা বা প্রতিষ্ঠা নেই যে, ঘরে বসে থাকলে কেউ তাদের খাবার দিয়ে আসবে, নিয়মিত তাদের খোঁজখবর নেবে। সাদামাঠাভাবে করোনাকালের এই হল দুটো পক্ষ; যারা লক-ডাউনের জন্য হাহাকার করছে, অন্য পক্ষ করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত নয়; বরং আতঙ্কিত তাদের জীবীকা নিয়ে। কারণ নানা ভাবে অতিরিক্ত আয় করে তারা কিছু সঞ্চয় করে রাখতে পারেনি যে দু-এক সপ্তাহ ঘরে বসে নিশ্চিন্ত খেতে পারবে। ফলে লক-ডাউন যারা চায়, আর যারা চায় না, তারা যে আলাদা দুটি অর্থনৈতিক পরিম-লে বাস করে, এ নিয়ে বিতর্ক করার কিছু নেই। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাই মূলগতভাবে তার জীবনযাপন আর সকল কার্যক্রম বা পন্থা নির্ধারণ করে দেয়।

প্রশ্ন আসতে পারে, যে দুটি পক্ষের কথা বলা হল, এর বাইরে কি আর পক্ষ নেই? হ্যাঁ আছে। তবে সেটা হল সম্পূর্ণ ভিন্ন পক্ষ যাদের চরিত্রটা বুঝে ওঠা কঠিন। সে তৃতীয় পক্ষ হল সরকার। করোনা ভাইরাসের মতোই তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা কঠিন। কারণ সরকার পক্ষ অনেক ক্ষেত্রেই, "ধরি মাছ না-ছুঁই পানি" এমন জায়গায় অবস্থান করছে। নারী সম্পর্কে একটা প্রবাদ আছে, "নারীর মন দেব না জানন্তি"। নারী সম্পর্কে সেটা সত্য কি-না বিতর্কসাপেক্ষ। তবে সরকারের মন বোঝা বড়ই কঠিন।

করোনা ভাইরাসের এই মহামারিকালে বাংলাদেশের সরকার লক-ডাউন কথাটা কখনো বলেনি। প্রথম থেকেই ছুটি ঘোষণা করেছে। পুনরায় কয়েকবার ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। কথাটা খুব স্পষ্ট, ছুটি আর লক-ডাউন এক কথা নয়। ফলে মানুষজন ছুটিকালীন সময়ে অফিস আদালতে যাবে না এটা বোঝা যায়, কিন্তু মানুষজন আর কী করবে বা করবে না এ ছুটিকালীন সময়ে তা নিয়ে কিছু বলা হয়নি। ছুটি মানে তারা কর্মস্থল ছেড়ে গ্রামে বা অন্যত্র যেতে পারে ছুটি কাটাতে, বা না-ও যেতে পারে। সম্পূর্ণ এটা তাদের স্বাধীনতা, তাদের এখতিয়ার তারা কী করবে। সরকারের এ ব্যাপারে সামান্য নির্দেশনা নেই। ঢাকার বহু ভদ্রলোকেরা তখন তাদের গৃহকর্মীকে সাময়িক ছুটি দিয়েছে, কেউ কেউ সম্পূর্ণ বিদায় করে দিয়েছে। ফলে এদের হাতে কাজকর্ম নেই, ঢাকায় এদের থাকার ভালো ব্যবস্থা নেই। ফলে নিজেদের বিবেচনামতো তারা নিজ নিজ গ্রামে চলে যাবার কথাই ভাবল। সকলে তারা গ্রামে যাত্রা করল। এটা ছিল সম্পূর্ণ তাদের নাগরিক অধিকার। কিন্তু পর দিন বহু প্রগতিশীল ভদ্রলোকদের বার্তায় এ সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ হতে দেখা গেল। সকলে মনে করল এরা করোনা ভাইরাস ছড়াচ্ছে। কিসের ভিত্তিতে ভদ্রলোকেরা নিশ্চিত হল যে, তারা সকলে করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত? দ্বিতীয়ত যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কেউ প্রমাণ করেনি তারা আক্রান্ত তখন ঢালাওভাবে এমন অভিযোগের ভিত্তি ছিল না। পরে তা প্রমাণিতও হয়নি। সর্বশেষ কথাটা হল, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষিত হলে গ্রামে যাবে না শহরে থাকবে এ ব্যাপারে আদৌ কারো নাক গলাবার সামান্য অধিকার ছিল কি? সাধারণ মানুষ ভিড় ঠেলে যাবে, না আরাম করে যাবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার অধিকার কি দিয়েছে কেউ কাউকে? সাধারণ মানুষ প্রতি ঈদে এরকমভাবে নিজ ঠিকানায় যাত্রা করে আসছে বছরের পর বছর ধরে। এটা তাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার। ভদ্রলোকদের বা কারো এ নিয়ে তাদের প্রতি সামান্য কটুক্তি করার অধিকার ছিল না। রাষ্ট্রের বা দেশের ভালোর জন্যও নয়। যদি দরিদ্র সেসব মানুষরা দেশের মঙ্গলের জন্য ভদ্রলোকদেরকে কখনো জিগ্যেস করত, "কেন তোমার দেশের ক্ষতি করে বিদেশে চিকিৎসা করাতে যাও, কেন তোমরা দেশের এত টাকা ব্যয় করে সন্তানদের বিদেশে পড়াও, কেন তোমরা বিলাসিতার পেছনে এত অর্থ ব্যয় করো, কেন তোমরা প্রয়োজনের চেয়ে এত অতিরিক্ত খেয়ে রোগ-শোক ডেকে আনো," ভদ্রলোকেরা কি সেটা পছন্দ করত নাকি সেটাকে পাত্তা দিত?

যারা কয়েক মাসের খাবারদাবার নিয়ে ঘর নিশ্চিন্তে বসে লক-ডাউন পালন করে সময় কাটাতে পারে তাদের সঙ্গে দারিদ্র্যেও সম্পর্ক নেই। ভালো রান্না করে খাওয়ার সুযোগ যেমন তাদের আছে, ঠিক নিয়মিত আবার ফেসবুকে খাবারের বা ছাদ-বাগানের ছবি দিতে পারে। সন্তানের বা পরিবারের জন্মদিন পালনে করোনা ভাইরাস সামান্য সঙ্কট সৃষ্টি করে না তাদের জন্য। করোনা ভাইরাসের আক্রমণে মরে যাওয়ার আতঙ্কটুকু ছাড়া জীবনযাত্রা তাদের যথেষ্ট স্বাভাবিক। লক-ডাউন তাদের কাছে এখন বিরাট চাহিদা, চাহিদাটা তৈরি হয়েছে তাদের নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার জন্য। লক-ডাউন রক্ষা করা হচ্ছে না বলে তারা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। নিশ্চয় আমাদের মতো ভদ্রলোকদের দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে কায়িক শ্রম দিতে হয় না। চাল ডাল তরকারি মাছ মাংস কোথা থেকে উৎপাদিত হয় তা পর্যন্ত সকলের জানতে হয় না। যথেষ্ট টাকা আছে, দরকারমতো নিত্যপ্রয়োজনীয় চাল ডাল মাছ মাংস তরকারি বা বিলাসদ্রব্য কিনতে পারে দাম যা-ই হোক। লক-ডাউন লক-ডাউন করে তাই তারা সবকিছু মাতিয়ে তুলছে। যারা লক-ডাউন মেনে চলছে না তাদের সম্পর্কে যখন যা-খুশি মন্তব্য করছে। যারা কাজের সন্ধানে বা খাবারের সন্ধানে লক-ডাউন মানছে না যদি পুলিশ বা প্রশাসন তাদের ঠেঙ্গিয়ে ঘরে বন্দি করে তাতে আমার মতো এসব সুধীজনদের সামান্য আপত্তি নেই। বরং পুলিশ তখন আমাদের বন্ধু বা আপনজন হয়ে দাঁড়ায়। লক-ডাউন-প্রীতি আমাদের এত বেশি যে, সামান্য এ কথাটা পর্যন্ত বিবেচনা করতে রাজি নই তখন যে, সাধারণ নাগরিকদের গায়ে হাত তুলবার সামান্য অধিকার নেই প্রশাসনের। সংবিধান তা অনুমোদন দেয় না। কিন্তু ভদ্রলোকেরা মনে করছে, লক-ডাউন পালন করার জন্য পুলিশ পিটিয়ে নাকি ঠিক কাজটিই করছে। কিন্তু রাষ্ট্র যখন এদের চিকিৎসা দিতে পারে না তখন ভদ্রলোকেরা কী ভূমিকা পালন করে?

সকলের নিজের মতো করে ভালো থাকা অধিকার আছে। ভদ্রলোকেরা নিজেরা সুস্থ থাকতে চায়, সেজন্য তারা নিজের ইচ্ছায় নিজের আরোপিত লক-ডাউন মেনে নিয়েছে, ইউরোপ-আমেরিকার অনুকরণ করে। নিশ্চয় সে অধিকার তাদের আছে। ফলে সরকার লক-ডাউন না বললেও তারা ছুটিটাকে লক-ডাউন হিসেবে চালিয়ে দিচ্ছে। তাতে দোষের কিছু নেই, নিজের ভালো ভিন্ন কারো ক্ষতি না-করে তারা চাইতেই পারে। কিন্তু নিজের ভালোর জন্য আগ-বাড়িয়ে অন্যের ভালো চাইতে পারে না। নিজেদের ওপর আরোপিত লক-ডাউন অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইতে পারে না। কিন্তু আগেই বলেছি এসব ব্যাপারে সরকারের মন বোঝা দায়। আইইডিসিআর বলেছে, যারা করোনা-আক্রান্ত নয় তাদের মাস্ক পড়ার দরকার নেই। কিন্তু দেখা গেল মাস্ক না-পড়ার জন্য পুলিশ জনসাধারণকে পেটাচ্ছে। সরকার বলেছে, কাঁচাবাজার দোকানপাট খোলা থাকবে। কিন্তু মানুষ হাটবাজার করতে গিয়ে পুলিশের হয়রানির শিকার হচ্ছিল। লক-ডাউন সরকার যেহেতু ঘোষণা করেনি, তা হলে তখন নাগরিকদের এক

অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে যেতে বাধা থাকার কথা নয়, কিন্তু পুলিশ বাধা দিয়েছে। সরকারের মন বোঝা এসব ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারের মন বুঝতে না-পারার আর উদাহরণ না-টানি। কারণ সকলের এসব অনেক কিছু জানা। সরকারের কাছে নিশ্চয় জবাব আছে এসব প্রশ্নের, জবাবদিহিতা কতটুকু আছে তা জানি না।

লক-ডাউন নিয়ে সরকারের মন বুঝতে না-পারার কারণেই আসলে ভদ্রলোকদের সঙ্গে অ-ভদ্রলোকদের ভুল-বুঝাবুঝিটা অনেক বেড়েছে। ভদ্রলোকেরা বলতে চাইছেন, সরকার কী করবে, মানুষ তো কথা শুনছে না। ভদ্রলোকদের কথায়, সরকার সঠিক জায়গায় আছে, হতচ্ছাড়া মানুষগুলো কথা না-শুনলে সরকার কী করবে। দিনের শেষে যত দোষ নন্দ ঘোষ। সব দোষ ছোটলোকের বাচ্চাদের। কিন্তু প্রশ্ন, সরকার আদৌ লক-ডাউন দিয়েছিল কি? ছুটির মধ্যে পোশাকশ্রমিকেরা কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল কেন? সত্যি বলবার সাহস আমাদের মতো ভদ্রলোকদের সবসময় থাকে না, সবসময় বহু দূর থেকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলি। বলির পাঁঠা সেখানে সমাজের দুর্বলেরা। যাদের এখন ছোটলোক বলে নিন্দা করা হচ্ছে, কদিন পর তাদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়বে না। নিজেদের চেহারাটা ভালো করে আয়নায় দেখি না, তা হলে বোঝা যেত কতটা উচ্চস্তরে বাস করি আমরা!

সরকার এখন ছুটি তুলে দিয়েছে। সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত বা দ্বিমত পোষণ করতে পারি। কিন্তু নিন্দুকেরা বলছে, জুন মাস সামনে রেখে হঠাৎ এই ছুটি বাতিল এসব আমলাদের চক্রান্ত। বাজেটের আগে পুরনো সব পাওনা সব বুঝিয়ে দিতে না-পারলে, নিজেদের পাওনাটা পকেটে আসবে না। বাজেট ঘোষণার আগে জুন মাসে তড়িঘড়ি করে তাই ছুটি বাতিল করা হয়েছে। লক্ষ করলাম, নিজের ফেসবুক-বার্তায় একজন সরকারকে নির্বোধ বলেছে এ-জন্যে। কথাটা আমার ঠিক পছন্দ হয়নি নানা কারণে। সরকার নির্বোধ কিন্তু আর আমি বোধসম্পন্ন এটা একটা আত্মঅহমিকার প্রকাশ। যাই হোক, সরকার নির্বোধ এমন বাক্য ব্যবহার করার মতো অতটা নিশ্চিত বোধসম্পন্ন মানুষ আমি নই। নিজেকে আমি এতটা সঠিক মনে করি না। ভাষা ব্যবহারে কাউকে চট করে নির্বোধ বলাটাও আমি সঙ্গত মনে করি না। কারণ কে নির্বোধ আর কে বোধসম্পন্ন তার বিচার করবে কে? কিন্তু এটা বলতে পারি করোনা ভাইরাস আক্রমণ মোকাবেলায় সরকারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট দ্বিমত আছে, বিভিন্ন সমালোচনা আছে। সরকারের জাতীয় কমিটির সদস্যরা পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা আরো অনেক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের সমালোচনা করেছেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের চিকিৎসা দানে সরকারের ব্যর্থতা সর্বত্র আলোচিত। ফলে সরকারের নানা সমালোচনা আছে আমার দিক থেকে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে। শুধু করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বলছি কেন, বহু ক্ষেত্রেই সরকারের নীতির সঙ্গে দ্বিমত আছে। বর্তমান সরকারের সঙ্গে যেমন আছে, গত ঊনপঞ্চাশ বছরের প্রতিটি সরকারের সঙ্গে নাগরিক হিসেবে আমার চিন্তার নানা অমিল ছিল। তার মানে এই নয় যে সর্বদা আমি ঠিক ছিলাম। কিন্তু ভুল বা ঠিক হই, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার রাষ্ট্রে আমার থাকতে হবে, সেটাই প্রকৃত গণতন্ত্র। রাষ্ট্রের সংবিধানই আমাকে সেই সমালোচনা করার অধিকার দিয়েছে।

সরকার যে গত একত্রিশে মে থেকে ছুটি আর বাড়ায়নি বা তথাকথিত লক-ডাউন তুলে দিয়েছে তাতে বেশিরভাগ খেটে-খাওয়া মানুষের সমর্থন আছে। ঢাকায় বসে সেটা আমরা অনেকে বুঝতে পারছি না। কারণ খেটে-খাওয়া মানুষেরা ঘরে বসে না-খেয়ে মরার চেয়ে কাজ করে উপার্জনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনলাভের নিশ্চয়তা চাইছে। যদি তারা স্বাভাবিক জীবন লাভ করার শর্তে করোনা-র আক্রমণে মরতে ভয় না-পায়, সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার কিছু নেই। যদি কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে জীবন বিসর্জন দিতে চায় কার কী বলার আছে! শ্রমিকেরা যখন নোংরা পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হয়, শ্রমিকেরা যখন কয়লার খনিতে বিষাক্ত পরিবেশে কাজ করে, কিংবা যখন অনেক বাড়িতে গৃহকর্মীরা অসুস্থ শরীর নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়, তখন তাদের জীবন-মরণ নিয়ে আমরা তো চিন্তিত থাকি না। আজ তবে আর চিন্তিত কেন? যদি তাদের জীবন বিনাশ হয়, হবে। না-খেয়ে রোগে-শোকে তারা তো মারা যাচ্ছেই, এ আর এমন কী! যখন আগে কখনো এসব নিয়ে ভাবিনি, আজ ভাবছি কেন? বরং যারা লক-ডাউনে না-থেকে স্বাভাবিক জীবন বজায় রাখতে চায় না, বিভিন্ন কারণে তাদেরকে ধন্যবাদ দেবার আছে। মনে রাখতে হবে, সকল সত্যের বিপরীত সত্য আছে। নিশ্চয়, যারা লক-ডাউন চেয়েছে তারা যে বিরাট ভুল করেছে তা তো নয়। কিছু মানুষ লক-ডাউনে থাকতে চেয়েছে বলে বা লক-ডাউনে তাদের থাকার সৌভাগ্য ছিল বলেই, পথে-ঘাটে ভিড় বা জনস্রোত কম ছিল। সেটা অন্যদের আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। সেটা আরো ভালোভাবে হতে পারত যদি সরকারের এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা দিকনির্দেশনা থাকত। হয়তো তাহলে লক-ডাউন এতটা দীর্ঘ করতে হত না। কিন্তু আসলে না হয়েছে ঘর-কা, না হয়েছে ঘাট-কা।

যাঁরা গৃহবন্দি হতে চেয়েছেন, এটা নিঃসন্দেহে তাঁদের একটা ইতিবাচক পরিকল্পনা ছিল। মানুষ গৃহবন্দি থাকলে সংক্রমণ ছড়াতে সময় লাগে। সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সাধারণ মানুষেরা যখন লক-ডাউন চেয়েছে, সরকার তখন টানা দেড় মাস লক-ডাউন ঘোষণা করে, সেই অবসরে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে পারত। কারণ পুরো দেশকে সঠিকভাবে লক-ডাউন

রাখা গেলে, সংক্রমণ খুব কমই ছড়াত। সরকার আন্তরিক হলে সেই সুযোগে হাসপাতালে যা যা চিকিৎসা সামগ্রী দরকার তা জোগাড় করতে পারত। নতুন কিছু হাসপাতাল তৈরি করা যেত সে অবসরে। চিকিৎসক আর স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে করোনা প্রতিরোধে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যেত। ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থায় যে ল্যাজে-গোবরে অবস্থাটা হয়েছে তা হত না। কিন্তু সরকারের আসলে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই ছিল না। সকল সঙ্কটের কারণ সেখানেই। দুঃখজনক যে, সঙ্কটের আসল কারণ সন্ধান না-করে ভদ্রলোকেরা সকল দোষ চাপিয়েছে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। সাধারণ মানুষ ঘরে থাকেনি কেন? কারণ রাষ্ট্রটা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র নয়। বহুদিন ধরে সেখানে বিধিবিধানগুলো জনকল্যাণমূলক নয়। সরকার জনবিচ্ছিন্ন তো বটেই, ভদ্রলোকেরা পর্যন্ত শ্রমজীবী মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেয় না। যারা কায়িক শ্রম দেয়, তাদেরকে মনে করে নির্বোধ ছোটলোক। কিন্তু ভুলে যাই, এই নির্বোধ লোকেরাই পুরো দেশের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছে। রাষ্ট্রের বিরাট সঙ্কটে তারা ভদ্রলোকদের সাহায্য ছাড়া সংগ্রাম করে টিকে থাকবে, ভদ্রলোকেরা তাদের সাহায্য ছাড়া তা পারবে না।

নিশ্চয় শ্রমজীবী মানুষের চিন্তাভাবনার নানা ত্রুটির দিক রয়েছে। কিন্তু সেসব নিয়ে কখনো কি ভদ্রলোকেরা ভেবেছেন? সাধারণ মানুষের ত্রুটিগুলো কী? কেন? আর তা কীভাবে সমাজের ক্ষতি করে? স্মরণ রাখতে হবে, শ্রমজীবী মানুষের সকল অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ধনিকরা, সুবিধাভোগীরা। হ্যাঁ, মার্কস, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ তাঁরা সকলে দেখিয়েছেন, পুষ্টির অভাব, মানুষের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার না-পাওয়া, কাজের একঘেয়েমি তাদের পঞ্চইন্দ্রিয়কে ভোঁতা করে দেয়। ফলে জীবনের কঠিন লড়াইয়ের ব্যস্ততায় গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রতি তাদের দৃষ্টিকে আর সহজে প্রসারিত করতে পারে না। চিন্তা-ভাবনা হয়ে পড়ে গ-িবদ্ধ। ভয়-ভীতি তাদের সেভাবে তাড়িত করে না। তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায় শুধু টিকে থাকবার লড়াই। সেজন্য তারা ভালো-মন্দ যে-কোনো পথ বেছে নিতে পারে। হতে পারে চরম নিষ্ঠুর। কারণ টিকে থাকাটা তখন আসল কথা। ফলে দেখা যায় এরা অনেকে হয়ে দাঁড়ায় গোপন জগতের সহযোগী যোদ্ধা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে সেই নিষ্ঠুর কঠিন পথ বেছে নেয়। স্বভাবতই, সে দোষটা তাদের নয়। রাষ্ট্র এবং সমাজ তাদেরকে সে পথে নিয়ে গেছে। সে অপরাধটা রাষ্ট্রের আর তার জন্য দায়ী ধনীদের শোষণ আর লোভ। সকল মানুষের শিক্ষালাভের চরম সার্থকতা হচ্ছে, শ্রমজীবী এই মানুষদেরকে সম্মান দেখাতে পারা, তাদের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য ভাবতে পারা। করোনা-কালে ঠিক তার উল্টোটাই ঘটেছে বেশি। লক-ডাউনটা এতদিন চলেছে আসলে ভদ্রলোকদের অনেকের সুবিধামতো। নিজেরা আমরা ঘরে নিরাপদে থেকেছি, অথচ বাড়ির চাকর-বাকর বা দারোয়ানকে হাজার কাজে বাইরে পাঠিয়েছি। তখন সামান্য চিন্তা করিনি যে, সে মানুষটা আক্রান্ত হতে পারে কি-না। তখন আমরা আমাদের অর্থেও দাপট দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থে লক-ডাউন ভঙ্গ করেছি। সত্যি কথাটা হল এই, আমরা ভদ্রলোকেরা যখন যে কথাটা বলি, শুনতে তা ভালো-মন্দ যা-ই হোক, বলি নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে। ভাব করি নিজেদের এক একটা মহাপ্রাণ হিসেবে। বিশেষ করে পোশাকশিল্পের মালিকেরা এ ব্যাপারে চরম নির্লজ্জতা প্রকাশ করেছে।

সর্বশেষ কথা

বাংলাদেশে যাঁরা এখনো লক-ডাউনে যারা থাকতে চান তাঁদের থাকতে কোনো বাধা নেই। কেউ তাঁদের না করবে না। যতদিন দরকার তাঁরা লক-ডাউনে থাকতে পারেন। কিন্তু এটাও সত্যি বাংলাদেশের অবস্থা যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে, মহামারি যে আকার ধারণ করেছে তাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা জন্য হয়তো সরকারিভাবেই আবার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য লক-ডাউন দিতে হবে। কিন্তু সেই লক-ডাউন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাথায় রেখে দিতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় বা উপজেলায় সে লক-ডাউন দরকার কিনা সেটা বিশেষভাবে মাথায় রাখতে হবে। সকল মানুষকে দরকার না-হলে লক-ডাউনের মধ্যে বন্দি করে ফেলার দরকার নেই। সব দিক বিবেচনা করে, খুব চিন্তাভাবনা করে, হিসাব-নিকাশ করে লক-ডাউন ঘটাতে হবে যেন সেটা পরিপূর্ণতা পায়। স্বল্প আয়ের এবং দরিদ্র সকল মানুষের খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে এই সময়কালে। সরকারকে সে সময়কালে ন্যূনতম প্রতিদিন এক লক্ষ লোককে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতায় আনতে হবে, জানতে হবে মানুষের সংক্রমণ কীভাবে বাড়ছে আর তাকে কীভাবে সামাল দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার সুবিধা বাড়াতে হবে। সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কাউকেই আর চিকিৎসা সুবিধা না-দিয়ে মৃত্যুর কবলে পাঠানো যাবে না। সরকারকে বুঝতে হবে চিকিৎসা পাওয়া প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। লক-ডাউন যেন সুফল লাভের লক্ষ্যে করা হয়, মানুষকে যেন অর্থহীনভাবে ঘরে বন্দি না-করে রাখা হয়। লক-ডাউন যেন করা হয়, মানুষকে আর লক-ডাউনে থাকতে হবে-না, সেইরকম চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে। বিশেষজ্ঞরা যা যা বলেছেন, সেই সূত্র ধরে বলতে পারি, সরকারকে পরিকল্পনা নিতে হবে, আগামী তিন মাসের মধ্যে সংক্রমণের সংখ্যা প্রতিদিন দশ জনে নামিয়ে আনতে হবে। ছয় মাসের মধ্যে নামিয়ে আনতে হবে শূন্যের কোঠায়। সরকার তা করতে চাইলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী পুরো জাতিকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত পরামর্শকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। সেইসঙ্গে সংক্রমণ প্রতিরোধে যেসব দেশ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। প্রয়োজনে সেইসব দেশের সহায়তা বা সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

লক-ডাউনে থাকার সুফল হয়তো আছে কিন্তু এর কুফল নিয়ে কি কখনো ভেবে দেখা হয়েছে? চিকিৎসাবিজ্ঞানের মনীষীরা বলেন, বিচ্ছিন্নতা আর একাকিত্ব ভয়াবহ রোগ ছড়ায় মানুষের ভেতরে, সেটাও এক ধরনের ভাইরাসের মতোই। মানুষের

অজান্তেই তা মানুষের শরীর আর মনে ধ্বংসের বীজ পুঁতে দেয়। ফলে মানুষের জিন-চরিত্রের বদল ঘটে যায়, ধেয়ে আসে নানান রোগ। একটা সমস্যার সুরাহা করতে গিয়ে আরো দশটা নতুন সমস্যা তখন তৈরি হয় এটাও বিখ্যাত এক দার্শনিকের কথা। কথাটা মিথ্যা নয়। ব্রিটিশদের তৈরি করা ভারতের আন্দামান দ্বীপের কারাগারে বহু সাহসী বিপ্লবী একাকিত্বের যাতনায় আত্মহত্যা করেছিলেন। যাঁরা মানুষের জন্য লড়াইয়ে জীবন দিতে ভয় পাননি, তাঁরা কারাগারের একাকিত্ব মেনে নিতে পারেননি। ফলে মৃত্যুকে বরণ করেছেন। মানুষকে যদি মানুষের সংস্পর্শ ছাড়া বাঁচতে হয়, সেটা কেমন বাঁচা? যাঁরা মারা যাচ্ছেন, তাঁদের মৃত্যুটাই-বা কেমন। হয়তো শেষবয়সে মানুষ মৃত্যুভয় নিয়ে ততটা ভাবে না। মৃত্যুর সময় নিকট-আত্মীয়দের কাছে পেতে চায়। নিকট-আত্মীয়রা কাছে থাকতে চায়। কিন্তু বর্তমানে মানুষের মৃত্যুকে নানাভাবে আরো যন্ত্রণাদায়ক করে তোলা হচ্ছে। কেউ কেউ মৃত্যুর আগে প্রিয়জনদের মুখগুলো দেখতে পাচ্ছেন না। প্রিয়জনেরা মৃত্যুর পর তাঁর কাছে যেতে পারছেন না।

মানুষ করোনা আক্রান্তের ভয়ে ভীত এই কারণে যে, একবার আক্রান্ত হলে সকলে তাকে ত্যাগ করবে। সেই ভয়ে তার সমস্ত মনোবল ভেঙে পড়ছে। মানুষ মনোবল হারিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। অনেকে হয়তো করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন শুধু আতঙ্কে। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে হয়তো তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। যখন মারাত্মক রোগে মানুষের অন্যকে কাছে পাবার কথা, ঠিক তখনি তাঁকে ছেড়ে সকলে দূরে সরে যাচ্ছে। মানুষের জীবনে এর চেয়ে করুণ অধ্যায় কী হতে পারে! মানে এরকম একটা সময় কি দীর্ঘদিন চলতে দেয়া যায়? মানুষকে তার ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ করে দেবে। কর্মচঞ্চল বহু মানুষ এখন এমনিতেই নিস্তেজ, যদি দীর্ঘদিন তার বন্দিদশা চলতে থাকে, মানুষ ভেতরে ভেতরে আরো নিস্তেজ হয়ে পড়বে। ফলে সরকারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন্ সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই অবস্থার অবসান ঘটাতে চায় রাষ্ট্র। কিছুতেই প্রক্রিয়াটাকে আর বেশি লম্বা বা দীর্ঘ করা যাবে না। সবকিছু বাদ দিয়ে ভাইরাসের ভয়ে মানুষ কতদিন গৃহবন্দি হয়ে থাকবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মানুষ কি বছরের পর বছর গৃহবন্দি থাকতে পারবে? থাকা কি সম্ভব? মানুষ কি কাজকর্ম-চাষাবাদ বাদ দিয়ে ঘরে বসে বেঁচে থাকার সকল রসদ জুটাতে পারবে? লক-ডাউনের শেষ ভরসা তবে কী? লক-ডাউন ছাড়াই-বা চলার পথ কী? সরকারকে সুনিদিষ্টভাবে তা বলতে হবে। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে হোক আর অভিজ্ঞ দেশের মতামত নিয়েই হোক। জনগণ বেশিদিন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে পারে না।

বিশ্বে বিভিন্ন ভাইরাস আছে এবং থাকবে। মানুষকে তার মধ্যেই টিকে থাকতে হবে। চালর্স ডারউইনের সেই কথাটাই আবার সত্য হবে, যোগ্যরাই টিকে থাকে। মানুষকে ভাইরাসের বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য ভয় পেয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বেড়ালে হবে না, ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার জন্য শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। শারীরিক এই সক্ষমতা অর্জন কঠিন কিছু নয়। নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া আর কিছুটা শারীরিক পরিশ্রম করা। চিকিৎসাবিজ্ঞান ইতিমধ্যেই যা বলেছে আর তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবীর চুরাশি-পঁচাশি শতাংশ মানুষ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকতে সক্ষম। ফলে করোনা ভাইরাসটি খুব শক্তিশালী কিছু নয়। প্রতি বছর কিছু মানুষ তো নানাভাবেই মারা যাবে। সে-সব নিয়ে এতদিন তো আমরা দুশ্চিন্তা করিনি। কিন্তু করোনা-র ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলাম কেন? মাত্র পাঁচ-ছয় শতাংশ মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্নে চুরাশি শতাংশ মানুষকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। স্বাভাবিক জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। করোনা-র আক্রমণে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের মধ্যে বড়-একটা সংখ্যাকেই হয়তো বাঁচানো যেত, যদি হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেনের অভাব না-ঘটত। বাকি যে দু-শতাংশ মানুষ যাঁরা শারীরিকভাবে আরো ভঙ্গুর বা বেশি সংকটজনক, নিশ্চয় তাঁরা ঘরে থাকবেন নিজেদের স্বার্থেই। নিশ্চয় সে-সব মানুষকে ঘরে সাবধানে রাখাটা কঠিন কিছু হবে না। হয়তো বয়সজনিত কারণে এঁদের একটা অংশ ঘরেই থাকেন। কিন্তু দু-শতাংশ মানুষের জন্য সকলকে বন্দি করে রাখার মানে হয় না। নব্বই শতাংশ মানুষের করোনা-র আক্রমণে কিছুই দরকার হচ্ছে না। নব্বই শতাংশ মানুষ তবে কাজকর্ম ফেলে ঘরে বসে থাকবে কেন? বিশ্বটাকে কেন মনে করবে কারাগার? নিজেদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করবেন তাঁরা, যখন যেখানে আক্রান্ত হন দেশে কিংবা বিদেশে, আক্রান্তরা সেখানেই, তা দেশে হোক বা বিদেশে হোক প্রয়োজন হলে হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হয়ে যাবেন। বিশ্বের প্রতিটি দেশকে এখন সকলের জন্য থেকে সেরকম ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সব বিচারে অক্সিজেন সরবরাহ করাটা করোনা ভাইরাসের প্রধান চিকিৎসা সেটা ইতিমধ্যেই বোঝা গেছে। বাসায় বা হাসপাতালে নানাভাবে সেটার ব্যবস্থা করা যায় সংকটজনক রোগীদের ক্ষেত্রে। পৃথিবীর জন্য নতুন একটা অভিজ্ঞতা এটা, হাসপাতালে অক্সিজেন দেয়ার সুবিধা বাড়াতে হবে। সরকারি হাসপাতাল বাড়াতে হবে আর সেখানে প্রয়োজনমতো অক্সিজেন দানের সুযোগ থাকতে হবে। চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িয়ে অনেকটা বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতে সত্তর লক্ষ বেকার ছিল। বহুদিন পর্যন্ত সে সঙ্কটের সমাধান হচ্ছিল না। বড় বড় রাজনীতিকেরা যা পারেননি, হিটলার নিজের পরিকল্পিত যুদ্ধের প্রয়োজনে কর্মহীনদের নানারকম কাজে নিয়োগ দিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান করেছিলেন। তিনি বিরাট এক সামরিক বাহিনী বানিয়ে ফেলেছিলেন। হিটলার এমনিতেই এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করেননি। কিছু কারণ ছিল। হিটলারের মতো আমি সেনাবাহিনী বাড়াবার কোনো পরামর্শ দিচ্ছি না। কথাটা একটা উদাহরণ

মাত্র। কিন্তু শিক্ষক, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যা তো বাড়ানো যেতেই পারে। তার দরকারও রয়েছে। বাইরের থেকে পণ্য আমদানি কমিয়ে সেসব পণ্যের কারখানা দেশে প্রতিষ্ঠা করলে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হবে। জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা বা বিভিন্ন রকম গবেষণার জন্য দেশের মেধাবীদের যুক্ত করতে হবে। কারণ প্রয়োজনীয় সব আবিষ্কার নিজের ঘরেই হতে হবে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান কিট কিংবা কিছু আবিষ্কার করলে, সেটার সকল দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টিশীল মেধার পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। দুর্বলতা থাকলে সেটা বাতিল না-করে উন্নত করার জন্য সহায়তা দিতে হবে। বিশ্বে এভাবেই বড় বড় বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশও এই প্রক্রিয়ায় জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে, বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে বড় বড় অবদান রাখতে পারবে। বাংলাদেশের মেধাবীরা অন্য দেশে গিয়ে অনেক কিছু করতে পারলে নিজ দেশে না-পারার কিছু নেই।

বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে মানসম্পন্ন চিকিৎসলয় প্রতিষ্ঠা করে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দিয়ে স্বাস্থ্য-সেবা বাড়ালে মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তা হলে নাগরিকদের স্বাস্থ্যের মান বাড়বে, তাদের প্রাণশক্তি এবং কর্মক্ষমতা বাড়বে। রাষ্ট্রের চেহারাটাই তা হলে পাল্টে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে উৎপাদন। বিভিন্নভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে যখন বেকারত্ব কমে যাবে, নানারকম বিশৃঙ্খলা কমে আসবে। সকল সেবামূলক খাতে, পরিবহন ব্যবস্থায়, ব্যক্তিগত উৎপাদনে সর্বত্র লক্ষ করা যাবে সুশৃঙ্খলা। রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা কমে যাবে। সকল রকম সন্ত্রাস বা নৈরাজ্যমূলক কর্মকা- হ্রাস পাবে। করোনা ভাইরাস অন্তত এটাও দেখিয়েছে, প্রতিটি দেশকে যতটা সম্ভব নিজের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। নিজের ওপর নির্ভরশীল হতে গেলেই, একই সঙ্গে কর্মসংস্থান বাড়বে। কর্মসংস্থান অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে। মানুষের স্বাস্থ্যকে উন্নত করে। কর্মসংস্থানের খাতগুলো সরকারকে খুঁজে বের করতে হবে। কর্মসংস্থান কেমন করে একটি দেশের চেহারা পাল্টে দেয় তার বিরাট উদাহরণ হল, প্রথম মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানি। ঘটনাটা হিটলারের হাত দিয়ে হয়েছিল, কিন্তু সেটা শিক্ষণীয় সকলের জন্য। হিটলার সেটাকে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করেছিল, কিন্তু মঙ্গলজনক কাজেও তা ব্যবহার করা যায়।

করোনা সংক্রান্ত কারণে অর্থনৈতিক নানা বিপদ কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে জার্মানির উদাহরণ দিয়েই শেষ করা যাক। নিঃসন্দেহে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল জার্মানি। যুদ্ধে জার্মানরা পরাজিত হয়। ফলে যুদ্ধের নানা দায়-দায়িত্ব জার্মানিকে বহন করতে হয়, বিশেষ করে যুদ্ধ বাধানোর দায়ে ক্ষতিপূরণ দান তাদের জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। ফ্রান্সের প্রস্তাব ছিল জার্মানি বিয়াল্লিশটি বাৎসরিক কিস্তিতে এক হাজার একশো বিশ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দেবে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় উনিশশো একুশ সালের মে মাসে জার্মানির জন্য মোট দেয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয় ছয়শো ষাট কোটি পাউন্ড। জার্মানি তার প্রথম কিস্তি পাঁচ কোটি পাউন্ড শোধ করল। তিন বছরের শর্তে এটাই ছিল তার নগদ অর্থে দেয় পরিশোধ। জার্মানির পক্ষে পরবর্তী ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। জার্মানি মিত্রশক্তিকে দেয় ক্ষতিপূরণের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ফ্রান্স জার্মানির ধাতুশিল্পের কেন্দ্রস্থল এবং কয়লা, অশোধিত লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা আশি ভাগ যেখানে পাওয়া যেত, সেই রূঢ় অঞ্চল দখল করে। রূঢ় অঞ্চল দখলের পর জার্মানির সার্বিক অর্থনৈতিক জীবন থমকে দাঁড়াল। এর পরিণতিতে জার্মানিতে চরম মুদ্রাসংকট দেখা দেয়।

বিশ সালের মাঝামাঝি মার্কের মূল্যমান তার স্বাভাবিক হার এক ডলারের বিনিময়ে বিশ মার্ক থেকে নেমে দাঁড়াল পাউন্ড প্রতি দুশো পঞ্চাশ মার্ক। একুশ সালের মাঝামাঝি তা বেড়ে দাঁড়াল এক পাউন্ড সমান এক হাজার মার্ক। তেইশ সালে পাউন্ড প্রতি পঁয়ত্রিশ হাজার মার্ক পাওয়া যেত। সে সময় মাত্র কয়েক পেন্সের বিনিময়ে জার্মানিতে রাজার হালে জীবনযাপন করা যেত বা যে কোনো বিদেশি মাত্র কয়েক শিলিংয়ের বিনিময়ে জার্মানির সর্বত্র পরিভ্রমণ করতে পারত। তেইশ সাল শেষ হবার আগেই মার্ক-এর মূল্যমান আরো নেমে গিয়ে এক ডলার সমান দাঁড়াল বিরাশি কোটি মার্ক। সে সময় এক জোড়া জুতার জন্য পঞ্চাশ লাখ মার্ক দিতে হত, ছাপাখানায় মুদ্রিত একটি সংবাদপত্রের জন্য দিতে হত বিশ লাখ মার্ক। সুটের একটি কাপড় সংগ্রহের জন্য বিশ সপ্তাহ কাজ করতে হত। জার্মানির অবস্থা এমন দেউলিয়ার পর্যায়ে গিয়েছিল যে জার্মানির রাইখস ব্যাংককে টাকা সরবরাহের জন্য তিনশো কাগজের মিল এবং বিশ হাজার ছাপাখানা বসাতে হয়েছিল। সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলত। বোঝাই যাচ্ছে যুদ্ধের পর জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিটলার সেই অবস্থা থেকে জার্মানির আর্থিক সঙ্গতি এমন জায়গায় নিয়ে যায়, এমন বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে আর যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে সকলকে এমনভাবে ছাড়িয়ে যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম চার বছর জার্মানিকে কেউই যুদ্ধে হারাতে পারেনি।

ফলে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার নানা রাস্তা থাকে। কৃষিকে রক্ষা করা আর কর্মসংস্থান তৈরি করা তার প্রধান একটি দিক। জনগণের স্বাস্থ্য সেক্ষেত্রে প্রধান আর একটি বিবেচনার বিষয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পুরনো আমলাতন্ত্র দিয়ে, পুরনো রাজনৈতিক কৌশল দিয়ে আর বিরাট কিছু অগ্রগতি হবে না। সম্পূর্ণ নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। সারা বিশ্ব জুড়েই এ নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা পাওয়া যাবে। সারা বিশ্বে অনেকে নিজেদের অর্থনীতির পুনর্মূল্যায়ন করছে। বহু রাষ্ট্রই বর্তমাস সঙ্কটের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের অর্থনীতিকে নতুন করে সাজাবে। বাংলাদেশকে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বা পাল্লা দিয়ে চলতে হবে। করোনা বিশ্বের জন্য নতুন কী পরিবর্তন আনবে? হয়তো খুব বেশি কিছু নয়। করোনা ভাইরাস রাতারাতি মানুষের সকল চিন্তাকে পাল্টাতে পারবে না। বিরাট পরিবর্তনের জন্য দরকার ঠা-া মাথায় বসে সুস্থ চিন্তা আর সঠিক পরিকল্পনা করা। নিশ্চয় সেটা

সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু এটা ঠিক, মানুষের চিন্তা-ভাবনার কিছু পরিবর্তন তো আসবেই। বিভিন্নমুখী নানা ছোটখাটো পরিবর্তন নজরে পড়বে। করোনা-র এই সংক্রমণকে ঘিরে পাওয়া যাবে বড় মাপের অনেক সাহিত্য। নিশ্চয় পাওয়া যাবে নতুন দর্শনের আলোচনা। মানুষকে সামনের দিকে তাকাতে তা বাধ্য করবে। কিন্তু পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব থেকে যাবে আরো কিছু কাল। সেইসঙ্গে মানবিক রাষ্ট্র, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা মানুষের চিন্তায় নিশ্চয় আগের চেয়ে অনেক বেশি উঁকিঝুঁকি দেবে। নতুন ভাইরাসের আতঙ্ক থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে নতুন স্বপ্ন দেখাবে।

[লেখক: নাট্য চিন্তক, প্রাবন্ধিক, গবেষক।]